বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আচার্য্য

হেমচন্দ্র সরকার, এম্‌, এ, ডি ডি

প্রণীত

শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী এম্‌, এ

সম্পাদিত

১৩৪০

সম্পাদিকার নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলি ৺পিতৃদেব মুকুলের জন্য লিখিয়াছিলেন। সেগুলি তৎকালীন মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন একত্রিত করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিলাম। সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাগণ এইগুলি পড়িয়া আনন্দলাভ করিলে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

সূচী

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

কয়লা।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, কয়লা জিনিষটা কি ? তোমরা হয়ত বলিয়া উঠিবে, কয়লা "কয়লা"। সে কথা সত্য ; কিন্তু কয়লা যে "কয়লা", অর্থাৎ কয়লা যে কাঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সত্যটি জানিতে মানুষের অনেক দিন লাগিয়াছিল ; আমরা এখন অনেক জিনিস বিনা পরিশ্রমে পাইতেছি ; সেইজন্য আমরা বুঝিতে পারি না, এগুলি আবিষ্কার করিতে মানুষের কত আয়াস লাগিয়াছিল। আট আনা পয়সা দিলেই দোকান হইতে এক মণ কয়লা পাওয়া যায়, সুতরাং আমরা ভুলিয়া যাই, প্রথমে কয়লার ব্যবহার আবিষ্কার করিতে কত লোকের বুদ্ধি লাগিয়াছিল। কয়লা ত' দূরের কথা। ইহার অপেক্ষা আরও একটী সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। এই আগুনের ব্যবহার ; আমরা প্রতিদিন আগুন জ্বালাইয়া কাজ করিতেছি, আগুন না হইলে এক মুহূর্ত্ত

চলে না। কিন্তু লোকে আগুনের ব্যবহার শিখিল কি প্রকারে? মনুষ্যজাতি প্রথমে কোথায় আগুন পাইল? আগুন ত নদীর জল নয়, যে তুলিয়া আনিবে; গাছের ফলও নয় যে পাড়িয়া খাইবে? তবে তাহারা আগুন পাইল কোথায়? এমন দিন ছিল, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না। এখনও পৃথিবীতে হয়ত এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এখন পর্য্যন্ত আগুনের ব্যবহার জানে না। সকল মানবজাতিকেই এই অসভ্য অবস্থার মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। তোমরা অনেকেই জান যে, যে ইংরাজ জাতি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত, দুই কি আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহারাই অসভ্য ছিল। অতি প্রাচীন কালে মানবজাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল; তাহারা তখন গৃহ বাঁধিতে জানিত না, জমি চষিয়া শস্য উৎপন্ন করিতে জানিত না, আগুনের দ্বারা খাদ্য-দ্রব্য রন্ধন করিতে জানিত না। তাহারা তখন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; ক্ষুধা পাইলে গাছের ফল মূল পাতা খাইত, অথবা বনের জানোয়ার মারিয়া কাঁচাই ভক্ষণ করিত। সে অনেক প্রাচীনকালের কথা; তারপরে ক্রমে ক্রমে মানুষ একটীর পর একটী জিনিষ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে ও তাহার দ্বারা আপনাদের অবস্থা উন্নত করিয়াছে।

সভ্যতার আরম্ভ বোধ হয় আগুনের ব্যবহার শিক্ষায়। যত-দিন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানে নাই, ততদিন তাহাদের অবস্থা প্রায় পশুরই মত ছিল। তারপর তাহারা কোনও প্রকারে আগুনের ব্যবহার জানিয়াছিল। কেমন করিয়া যে তাহারা ইহা শিখিল, তাহা কিছু বলা যায় না। পণ্ডিতেরা নানা প্রকার অনুমান করেন। এ সম্বন্ধে আর একদিন তোমাদিগকে কিছু বলিব। কেবল তোমরা ইহা জানিয়া রাখ, যে অনেক দিনে মানুষ আগুন ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল।

সেই প্রকার কয়লার ব্যবহার জানিতেও মানুষের অনেক দিন লাগিয়াছিল। বাস্তবিক, তিন কি চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে কয়লার ব্যবহার অতি সামান্য ছিল; কিন্তু আজকাল কয়লা না হইলে আমাদের একদিনও চলে না। লণ্ডনে কি নিউইয়র্কের মত সহরে একদিন যদি কয়লা না থাকে, তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটে। সর্ব্বপ্রথম কোন সময়ে যে কয়লার আবিষ্কার হয়, তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। থিওফ্রাষ্টাস্ নামক একজন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার খনিজ জ্বালানী দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, যে সে সময়ে কয়লার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করেন, ইংলণ্ডের প্রাচীন

অধিবাসী ব্রিটনগণ কয়লার ব্যবহার জানিতেন। সম্ভবতঃ ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডেই কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেখানে অনেক কয়লার খনি; মাটীর উপরেও অনেক কয়লা পড়িয়া থাকিত; কোনও দিন হয়ত তাহার একখানিকে আগুনে পুড়িতে দেখিয়া লোকে শীতের দিনে হাত পা গরম করিবার জন্য কতকগুলি কয়লা একত্র করিয়া আগুন জ্বালাইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে লণ্ডনে যে কয়লা ব্যবহৃত হইত, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে; কয়লার বড় ধূম হয় বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতেন। কিন্তু কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সে আপত্তি চলিয়া গেল! এখন ত কোথাও জ্বালানী কাঠের চিহ্নমাত্রও নাই।

এই ত গেল কয়লা আবিষ্কারের ইতিহাস। এখন কয়লা কি জিনিষ, তাহার আলোচনা করা যাউক। দেখিতে কাল পাথরের মত এবং মাটির মধ্যে পাওয়া যায়; সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে কয়লা এক রকম পাথর; কিন্তু পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে কয়লা গাছপালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যেখানে এখন কয়লার খনিসকল রহিয়াছে, বহু সহস্র

কয়লার খনি

বৎসর পূর্ব্বে সেখানে বিশাল অরণ্য ছিল ; গাছ হইতে পাতা, ডাল ইত্যাদি পড়িয়া সেখানেই জমিয়া থাকিত, ক্রমে তাহার উপর বালি ইত্যাদি জমিয়া যাইত ; কত গাছও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেখানে জমিত। এই প্রকারে বৎসরের পর বৎসর জঙ্গলের জলাভূমিতে কত উদ্ভিজ দ্রব্যসকল জমিয়া গিয়াছে। উপরের চাপে ও ভিতরের তাপে সেগুলি জমিয়া কয়লার আকারে পরিণত হইয়াছে। কি রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কাঠ ও পাতা কয়লাতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত ভালরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে কাঠ হইতেই যে কয়লা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্ম কয়লার স্তরসকল পরীক্ষা করিয়া তাহাতে গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশের চিহ্ন পাইয়াছেন। যে সকল ভৌতিক দ্রব্য কয়লাতে পাওয়া যায়, তাহা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদে বর্ত্তমান, এইজন্য কয়লা যে উদ্ভিজদ্রব্য হইতে উৎপন্ন, তাহা পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই কথাটা তোমরা বুঝিতে পারিলে কিনা জানি না, স্থতরাং আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক।

এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের পদার্থ আছে। সকল গুলিই আকৃতি প্রকৃতিতে পরস্পর হইতে বিভিন্ন। কিন্তু

পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, মূল পদার্থ অল্প কয়েকটী মাত্র; তাহাদের বিভিন্ন প্রকার সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। মনে কর, যেমন এক দুধ হইতেই, ছানা, মাখন, ঘি, দই, পণির প্রভৃতি নানা রকম জিনিস তৈয়ারি হয়; তেমনি কয়েকটী মূল পদার্থের যোগে এই পৃথিবীর অসংখ্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা এই মূল পদার্থ পাঁচটী মনে করিয়াছিলেন; সে পাঁচটী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। তাঁহারা বলিয়াছেন এই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম ইহাতেই এই পৃথিবী সৃষ্ট। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন, যে মূল পদার্থ পাঁচটি নয়; এবং পূর্ব্বে যে গুলিকে মূল পদার্থ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, সে গুলিও মূল পদার্থ নহে। যেমন জল (অপ্)। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহাকে একটি মূল পদার্থ বলিয়া ধরিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ ভাল করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, যে জল মৌলিক পদার্থ নহে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসের বিশেষ রাসায়নিক সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর।

যাহা হউক এখন যদি বলি, কতকগুলি ভৌতিক পদার্থের সংযোগে কয়লা উৎপন্ন, তাহা বুঝিতে তোমাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না। কয়লাতে পাঁচ ছয়টি ভৌতিক বা মূল পদার্থ আছে। তাহাদের মধ্যে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনই প্রধান। প্রতি ১ শত ভাগ কয়লাতে প্রায় ৭৩ হইতে ৯০ ভাগ কার্ব্বন আছে। এই কার্ব্বনের সঙ্গে অক্সিজেন মিশিয়াই তাপ ও অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা দেখিতেছি, যে কয়লার প্রধান উপাদান কার্ব্বন; এই কার্ব্বন উদ্ভিজ পদার্থে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। উদ্ভিদ সকল মাটীর মধ্যে পচিয়া তাহার অন্যান্য অংশের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; কার্ব্বন ভাগ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কয়লারূপে পরিণত হয়। পণ্ডিতেরা কাদার মধ্যে উদ্ভিদ পদার্থ রাখিয়া তাহাতে চাপ দিয়া দেখিয়াছেন যে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কয়লার মত পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে মাটীর মধ্যে গাছপালা পচিয়া উপরের চাপে বিশেষ কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কয়লাতে পরিণত হয়।

কিন্তু কেহ যেন মনে করিও না, দুই এক বৎসরে এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। গাছ হইতে কয়লা হইতে বহু সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। এক একটি কয়লার খনি

বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া সৃষ্ট হইতেছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে একটি বিশাল অরণ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন মাটির স্তর পড়িয়াছে। তার উপরে আবার নূতন অরণ্য জন্মিয়াছে, আবার সেটিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কত অরণ্যের ধ্বংসাবশেষে তবে একটি খনি প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং একটি খনির জন্ম হইতে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে পার। পৃথিবীতে যত কয়লার খনি আছে, তাহার সৃষ্টি হইতে যে কত মহা অরণ্য লাগিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইয়া যাইতে হয়। একটী কথা বলিলে তোমরা ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীতে এখন যত গাছ পালা আছে, সব যদি কয়লা হইয়া যায়, তাহা হইলে দুই কি তিন ইঞ্চি পুরু কয়লার খনি হইতে পারে; কিন্তু যে সকল খনি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি ৪০।৫০ ফিট পুরু। যে সব বড় বড় অরণ্য হইতে কয়লা হইয়াছে, সেগুলি পৃথিবীতে মানুষ জন্মিবার বহু বহু পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল। দেখ, সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা এখন আবার তাহা হইতেই কত উপকার পাইতেছি। এই আশ্চর্য্য পৃথিবীতে কোনও জিনিসই নষ্ট হয় না। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অরণ্যের

চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এখন আবার তাহাই জগতের কাজে আসিতেছে। ইহা কি এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়? এই বিশ্ব সংসারে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পরমেশ্বরের লীলার পরিচয় পাই।

আগুন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আগুনের কথা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছিলাম, বোধ হয় আগুনের ব্যবহার শিক্ষা হইতে সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছিল। এমন দিন ছিল, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না; তখন তাহারা গাছের ফল বা মৃগয়ালব্ধ মাংস কাঁচাই ভক্ষণ করিত। তৎপরে কোনও প্রকারে আগুনের ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কোথায় কোন্ সময়ে কি প্রকারে যে মানুষ আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার নিশ্চিত ঐতিহাসিক কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহা পাইবার কথাও নয়; কারণ ইতিহাস লিখিবার মত সভ্য হইবার অনেক পূর্ব্বেই মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখিয়াছিল। আজকাল পৃথিবীতে যত অসভ্য জাতি আছে, তাহার কোনটীর মধ্যেই যে আগুনের ব্যবহার প্রচলিত নাই ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ দুই এক স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে সেখানে লোকে আগুনের ব্যবহার জানিত না। ইউনাইটেড ষ্টেটসের নৌসেনাপতি কমোডোর

উইলকিনস দেশ আবিষ্কারে বহির্গত হইয়া প্রথম যখন বোডিচ্ দ্বীপে যান, সে সময়ে সেখানকার লোক আগুনের ব্যবহার জানিত না, তিনি এরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা চুরুটের ধোঁয়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিত। স্পেন দেশের একজন পর্য্যটক আল্ভারো ডি সাবেদ্রা প্রশান্ত মহাসাগরে গম নামক দেশের লোকেরা আগুনের ব্যবহার জানিত না বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে তাহারা আগুনকে এক দুর্দ্দান্ত দস্যু মনে করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু অপর দিকে অন্যান্য কারণে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, যে উহারা অগ্নির ব্যবহার জানিত।

সে যাহা হউক, পৃথিবীর সভ্যজাতিগণের মধ্যে কিরূপে আগুনের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল সে বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ইহার ঐতিহাসিক কোনও বিবরণ নাই। কিন্তু সকল জাতির মধ্যেই ইতিহাস রচনা হইবার পূর্ব্বে পুরাণ সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাণে পৃথিবীর সৃষ্টির বিবরণ ও এক একটী জাতির উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা আছে। এই সকল আখ্যায়িকা সত্য না হইলেও অনেক সময়ে তাহাতে সত্যের একটু ছায়া পড়িয়াছে। অন্ততঃ, সেগুলি হইতে

সে কালে লোকে কি মনে করিতেন, তাহা জানিতে পারা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দিলে তোমাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে। তোমরা বোধ হয়, সকলেই ভূমিকম্প দেখিয়াছ এবং আশা করি, অনেকেই তাহার কারণ জান; কিন্তু প্রাচীনকালে লোকে তাহা জানিত না। অথচ কেন এমন করিয়া পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, এ প্রশ্ন তাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা কারণ নির্ণয় করা সে সময়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ একটা উত্তর ত দিতে হইবে। তাই সে কালের জ্ঞানী লোকেরা কল্পনার সাহায্যে এক একটী মীমাংসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে এই পৃথিবী বাসুকি নামক সর্পের ফণার উপর অবস্থিত, বাসুকির সহস্র ফণা; সে যখন এক ফণা হইতে অপর ফণায় পৃথিবীকে তুলিয়া লয়, তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। আমাদের দেশে পুরাণে এই আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার 'আচ্ছা, অগ্নির আবিষ্কার সম্বন্ধে ইতিহাসে ত কোনও বিবরণ নাই, পুরাণে কিছু আছে কি?" তদুত্তরে বলিতে পারা যায়, "নিশ্চয়ই আছে।" প্রায় সকল দেশের পুরাণেই অগ্নির উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দেখা যায়, পুরাকালে অনেক দেশে লোকে আগুনকে দেবতা মনে করিতেন।

তোমরা বোধ হয় জান, যে আমাদের দেশের পার্শী সম্প্রদায়কে অগ্নি-উপাসক বলে। প্রাচীনকালে হিন্দুরাও অগ্নিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। হিন্দুজাতির প্রধান শাস্ত্র বেদে অগ্নির অনেক স্তব আছে। তার পরে অগ্নিকে দেবতাদের দূত মনে করা হইত। অগ্নি পৃথিবী হইতে যজ্ঞের আহুতি বহন করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট লইয়া যান, পুরাকালে ঋষিগণ এরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন।

আগুনের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাদেশের পুরাণে যে সব আখ্যায়িকা আছে, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ প্রাচীন গ্রীকপুরাণে যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ করিতেছি। গ্রীসে প্রাচীনকালে অতি উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে পুরাকালে প্রমিথিউস নামে একজন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ও মহাবলশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতারাও তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে হারিয়া যাইতেন। প্রমিথিউসের সময়ে পৃথিবীতে অগ্নি ছিল না। প্রমিথিউস মানবের কল্যাণের জন্য স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরী করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহার জন্য দেবতারা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কঠোর দণ্ড দেন।

অনেক দেশের পুরাণকারেরাই মনে করিয়াছিলেন যে আদিকালে স্বর্গেই অগ্নি ছিল এবং মানব-হিতৈষী কোনও মহাপুরুষ সেখান হইতে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ টোঙা দ্বীপের লোকেরা বিশ্বাস করে, যে ভূমিকম্পের দেবতাই অগ্নির দেবতা। মাঙ্গাইয়া দ্বীপের লোকেরা মনে করে, যে মাপুই নামক তাহাদের দেশের একজন মহাপুরুষ নরকে যাইয়া সেখান হইতে অগ্নি প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। নিউজিলণ্ডের মেওরিদের মধ্যে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। তাহাতে বলে তাহাদের দেশের একজন মহাপুরুষ মনীর পিতামহী আপনার নখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া মনীকে দিয়াছিলেন। বিখ্যাত পারসী গ্রন্থ সানামাতে লিখিত আছে, যে বিখ্যাত বাব হুসেন অগ্নি আবিষ্কার করেন। তিনি একটী দুর্দ্দান্ত দানবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। দানবটী কৌশলে সরিয়া দাঁড়ায়; তখন প্রস্তরখানি সবলে একটী পাহাড়ে গিয়া লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়। সেই প্রথম পৃথিবীতে অগ্নির আবির্ভাব। দানব বাঁচিয়া গেল বটে; কিন্তু মানুষ অগ্নি প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখিয়া গেল।

এখন আমাদের দেশে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, তাহার একটীর উল্লেখ করিব। বেদে লিখিত আছে, যে অগ্নির পিতামাতা অরণি। অরণির উদর হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া অশ্বের ন্যায় শোভমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। বেদে এই প্রকার বর্ণনা আছে। অরণি কিন্তু আবার একপ্রকার কাষ্ঠের নাম; ইহা দ্বারা এই বুঝাইতেছে, আমাদের দেশে প্রাচীনকালে লোকে কাঠে কাঠে ঘসিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিত।

তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ, এ সমুদয় আখ্যায়িকাই মানবের কল্পনাপ্রসূত গল্প মাত্র। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অনেক সময়ে সত্য ঘটনা হইতে আখ্যায়িকার উৎপত্তি হয়। এই সকল আখ্যায়িকা পড়িয়া মনে হয়, যে অতি প্রাচীন কালে কাঠে কাঠে সংঘর্ষণ হইয়া অথবা প্রস্তরে প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া প্রথমে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মানুষ তাহা দেখিয়া সেই অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সকল দেশেই যে এক প্রকারে আগুনের আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। অথবা কেবল একদেশে আগুনের আবিষ্কার হয় এবং সেখানে হইতে যে অন্যত্র তাহা প্রচারিত হইয়াছিল এরূপও মনে হয় না।

প্রাকৃতিক জগতে নানাপ্রকারে সর্ব্বদাই অগ্নি উৎপন্ন হইত। বনে, বৃক্ষে বৃক্ষে ঘসা লাগিয়া দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়, একথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। আগ্নেয়গিরির অগ্নু্যৎ-পাতেও আগুনের সৃষ্টি হয়; অনেক প্রস্রবণ হইতে গরম জল বাহির হয়। পাথরে পাথরে আঘাত লাগিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়। এইরূপ নানাপ্রকারে প্রাকৃতিক জগতে মানুষের সহিত অগ্নির পরিচয় হয়। ইহা দেখিয়া আদিম মানবেরা প্রথম প্রথম ভীত হইয়া পলায়ন করিত; কিন্তু ক্রমে যখন ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মানুষ তাহাকে বশ করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইল। এই গেল আগুনের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ।

গাছের পা।

গাছের পা! সে আবার কি কথা? গল্পের নাম পড়িয়াই তোমরা হয়ত হাসিয়া উঠিবে। "গাছের পা" এমন কথা ত কখন শুনি নাই! সেই ত বোধোদয়ে পড়িয়াছি, "যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অথচ জন্তুর ন্যায় গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহাদের নাম উদ্ভিদ।"

গাছেরা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। আমি কিন্তু সত্যই বলিতেছি, উহারাও একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে; তবে তাহার মধ্যে কিছু কথা আছে; এমন অনেক গাছ আছে, অনুবীক্ষণ ছাড়া তাহাদের শুধু চোখে দেখা যায় না, তাহারা অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, আর বড় বড় গাছেরা নিজে না যাক ছেলে মেয়েদের অন্যত্র পাঠায় এবং যাহা দ্বারা যায়, তাহাকে হয়ত পা না বলিয়া পাখা বলিলেই ভাল হইত। যাহা হউক তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তাহা না হইলে গাছপালা জন্মানই অসম্ভব হইত। কারণ গাছের বীজ হইতেই ত অন্য গাছ উৎপন্ন হয়। এখন যদি ফল-গুলি পাকিয়া তাহার বীজ সেই গাছের নীচেই পড়িয়া

থাকিত, তাহা হইলে আর নূতন গাছ হয় কি করিয়া? ছোট অঙ্কুরটী না হয় গজাইল; কিন্তু সেটী বাড়িতে আলো চায়, রোদ চায়, বাতাস চায়। কিন্তু তার মা যদি তার উপর আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে সে বেচারী বাড়ে কি করিয়া? আর বড় হইতে ত তার ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন। সুতরাং মার কোল ছাড়িয়া দূরে যাইতে হয়। মানুষের মধ্যেও তাই। একটী পরিবারে যখন ছেলে মেয়ে বড় হইয়া লোকের সংখ্যা বাড়ে, তখন নূতন ঘর নূতন বাড়ী করিতে হয়; সময় সময় এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে উঠিয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়। তোমরা হয়ত জান যখন এইরূপে জন সংখ্যা বাড়ে, তখন অন্ততঃ কতকগুলি লোকের এক দেশ হইতে অন্য দেশে উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ইহাকে উপনিবেশ স্থাপন করা বলে। তোমরা কি শুন নাই যে ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মাণী, প্রভৃতি প্রাচীন দেশে লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে; সেখানে আর লোকের স্থান হইতেছে না; লোকে চষিবার জমি পাইতেছে না; চাকরী পাইতেছে না। সেই জন্য এই সব দেশ হইতে বৎসর বৎসর অনেক লোক উঠিয়া গিয়া আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। গাছপালার ও সেইরূপ

নূতন নূতন স্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে বেচারীরা যায় কি করিয়া? মানুষের পা আছে, হাত আছে; নৌকা, ষ্টীমার, রেলগাড়ী করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। গাছেরা কি করিবে? তবে কি তাহারা যেখানকার সেইখানে পড়িয়া না খাইতে পাইয়া, রোদ, আলো, স্থান না পাইয়া মরিয়া যাইবে? না, তা মরিতে হয় না; পরমেশ্বর এমনি কৌশল করিয়া দিয়াছেন, যে গাছের ছেলে মেয়েরাও এক স্থান হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে গিয়া সুখে বসতি করে ও দিন দিন বড় হয়। তাহা কিরূপ করিয়া হয়, তোমাদিগকে বলিতেছি।

তোমরা সকলেই শিমুল গাছ দেখিয়াছ। শীতকালের প্রথমে বড় বড় লাল লাল ফুলে গাছ একেবারে ছাইয়া যায়। তারপর তাহা হইতে পটলের মত ফল হয়। সেই ফলের মধ্যে তুলা থাকে তাহাও তোমরা হয়ত জান। বসন্তের প্রখর রৌদ্রে সেই ফলগুলি পাকিয়া আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়, এবং তাহার ভিতরের তুলা উড়িয়া দিক্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে। তোমরা কি কখনও সেই তুলা ধরিয়াছ? তাহার একটী ধরিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, যে তাহার ভিতর কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধের বড়ির মত ছোট একটী কাল জিনিস রহিয়াছে। সেইটী

তাহার বীজ। অনেক দূর উড়িয়া উড়িয়া তুলাটী যেখানে পড়ে, সেই খানেই বীজ হইতে গাছ হয়। ঐ ছোট বীজটীকে বিদেশে পাঠাইবার জন্যই তুলার আয়োজন। মাঝে হইতে তোমার আমার বালিশের ও যে সুব্যবস্থা না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৌশল দেখিলে! আমার মনে পড়ে ছেলে বেলায় আমাদের গ্রামে এক মুসলমান ফকির ভিক্ষা করিতে আসিত; সে একটী গান করিত "আজব দুনিয়ার খেলা বোঝা দায়" অর্থাৎ আশ্চর্য্য এই সংসারের কৌশল বোঝা কঠিন। বাস্তবিক এই সংসারে অতি সামান্য সামান্য পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে যে গভীর জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, আমরা তাহার কত অল্পই জানি।

আরও এক কথা। মানুষ যখন এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তখন সঙ্গে কিছু পাথেয় লইয়া যাইতে হয়; যদি সেখানে লোকের বসতি না থাকে তাহা হইলে সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইতে হয়। নতুবা নূতন দেশে গিয়া কোথায় জিনিস পাইবে? গাছেরাও তাহাদের বিদেশ যাত্রী সন্তানদের সঙ্গে কিছু খাবার বাঁধিয়া দেয়। তাহা কেমন করিয়া হয় জান? ঐ যে বীজ দেখিলে উহার মধ্যে অনেক জিনিস আছে। যদি

একটী ছোলার দানা ভিজাইয়া রাখ, দুই একদিন পরে দেখিবে তাহার বুক চিরিয়া ছোট একটী সাদা মত জিনিস বাহির হইয়াছে। সেইটী আসল গাছ; আর দুদিকে যে দুইটী দানা ফাটিয়া পড়ে, সেগুলি শিশু গাছের খাবার। মানুষের শিশু যেমন জন্মিয়াই ভাত রুটী খাইতে পারে না, তাহার জন্য মায়ের বক্ষে দুধ থাকে, গাছের শিশুও তেমনি জন্মিয়াই মাটী হইতে খাবার টানিয়া লইতে পারে না; তখন তাহার জন্য খুব কোমল খাদ্য প্রয়োজন। বীজের মধ্যে সেই প্রকার খাদ্য থাকে; আর সেই খাদ্য একটী অপেক্ষাকৃত দৃঢ় আবরণে ঢাকা থাকে, তাহাই খোসা। দেখিলে, একটী ছোট বীজে কত কৌশল। পাখীর ডিমেও ঠিক এই প্রকার ব্যবস্থা। একটী হাঁসের ডিম ভাঙ্গিলে তোমরা তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ বাহিরের খোলাটী, তার ভিতরে সাদা অপেক্ষাকৃত কোমল পদার্থ, তার ভিতরে হরিদ্রাবর্ণের তরল পদার্থ। মোটামুটী বলিতে গেলে এই তরল পদার্থেই পাখীর দেহ ও প্রাণের উপাদান থাকে; সাদা জিনিসটা তাহার খাদ্য আর খোলাটী ঘর। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সে ঐ সাদা জিনিস হইতে খাদ্য লাভ করে ও খোলার ঘরে বসিয়া বাহিরের শীত, গ্রীষ্ম, ঘাত, প্রতিঘাতের

হস্ত হইতে রক্ষা পায়। আমরা কিন্তু আজ শুধু গাছের কথাই বলিতেছিলাম। শিমুলগাছ তুলার রথে তার বীজ-রূপী শিশুটীকে চড়াইয়া কিছু দিনের মত খাদ্য সঙ্গে দিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। তার পর শিশুটী পৃথিবীতে আপনার পথ আপনি করিয়া লয়।

শুধু যে শিমুল গাছই এইরূপ করে, তাহা নয়। প্রায় সকল বৃক্ষের জন্যই কোন না কোন প্রকারের ব্যবস্থা আছে। তোমরা অনেকেই হয়ত "কুকুরশোঁকা" গাছ দেখিয়াছ। ইহার অনেক গুলি ফুল এক সঙ্গে হয়। আমাদের কাছে যাহা একটী ফুল বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক তাহা অনেক ফুলের সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক বীজের আগাতে সাদা সাদা সোঁয়া ছাতার আকারে সাজান দেখা যায়। যখন ঐ বীজগুলি বাতাসে উড়িতে থাকে তখন ছাতার আকারের সোঁয়াগুলি বেশ খুলিয়া যায় এবং তাহাতে উহারা অনেকক্ষণ শূন্যে উড়িতে পারে এবং সুবিধা মত আপনাদের থাকিবার জায়গা খুঁজিয়া লয়।

আমরা যাহাকে সজনার ডাঁটা বলি, বাস্তবিক তাহা ডাঁটা নয়। উহা সজনা গাছের ফল। একটী সজনার ফল ভাঙ্গিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে অনেক বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী বীজের গায়ে পাখার মত

জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাখার সাহায্যে বীজ-গুলি অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যাইতে পারে।

তোমাদের মধ্যে অনেকে মাধবীলতা দেখিয়া থাকিবে। বসন্তকালে উহার কেমন সুন্দর সাদা সাদা ফুল হয় এবং তাহার গন্ধে চারি দিক কেমন আমোদিত হয়। যখন ঐ ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে, তখন গাছে অনেক ফল ঝুলিতে থাকে। একটুকু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, যে ঐ সকল ফলের প্রত্যেকটীতে যেন জোড়া জোড়া পাখা বসান হইয়াছে। ঐ পাখা তাহাদিগকে এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে সাহায্য করে।

বর্ষাকালে সাদা লাল এবং বেগুণে ইত্যাদি নানা রংএর কত দোপাটী ফুল ফোটে। ইহার ফলের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। একটুকু জোরে ছুঁইবা মাত্র উহা ফাটিয়া সঙ্কুচিত হয় এবং বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সকল উপায় ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও গাছেরা আপনাদের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। ওকরা বলিয়া এক রকম ফল হয়। তাহার গায়ে খুব কাঁটা আছে। ছাগল, ভেড়া মাঠে চরিতে গেলে ঐ ফলগুলি তাহাদের

লোমে আটকাইয়া যায়, এইরূপে তাহারা একস্থান হইতে অন্যত্র আনীত হয়।

এই যে নানা রং এর কত সুমিষ্ট ফল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের উদ্দেশ্য কি? কেবল কি আমাদের রসনা-তৃপ্তির জন্য ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে? তাহা নয়, গাছগুলি সুন্দর সুমিষ্ট ফলের দোকান সাজাইয়া পাখীদিগকে যেন ডাকিতেছে, "এস, আমাদের দোকানে এস।" পাখী আসিয়া ঐ ফল খাইবে এবং সেই বীজ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে।

পরমেশ্বর এই পৃথিবীকে কি সুন্দর নিয়মে বাঁধিয়াছেন। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী জগৎ সকলের মধ্যে এক নিয়ম দেখা যায়। একটুকু মনোযোগের সহিত দেখিলেই প্রকৃতির কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের নয়নগোচর হয় এবং যিনি এই সকলের পশ্চাতে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই জগৎ যন্ত্র চালাইতেছেন, তাঁহারই কথা আমাদের মনে পড়ে, এবং প্রাণের ভক্তি ও ভালবাসা তাঁহারই দিকে ছুটিয়া যায়।

গাছের মুখ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা গাছের পায়ের কথা বলিয়াছিলাম; আজ গাছের মুখের কথা বলিব। গাছের যে মুখ আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, সকলেই জানে, গাছ সজীব পদার্থ। গাছের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, তারপর মৃত্যুও হয়। সুতরাং গাছ সজীব পদার্থ। গাছ যদি সজীব পদার্থ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে কোনও প্রকার আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। সুতরাং প্রশ্ন আসিতেছে, গাছ খায় কেমন করিয়া? তাহার মুখ কোথায়? তোমরা হয়ত বলিবে, এ ত বেশী কিছু কঠিন প্রশ্ন হইল না। সকলেই জানে, উদ্ভিদ সকল মূল দিয়া রস আকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। এ উত্তর যে একেবারে ভুল হইল, তাহা নয়। এ কথা সত্য, যে গাছেরা শিকড় দিয়া মাটীর রস আকর্ষণ করে এবং সেই রসে তাহাদের জীবন ধারণের সাহায্য হয়। কিন্তু তাহারা শিকড় দিয়া যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা সব নয়; তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, তাহাতে বৃক্ষ জীবনের অপেক্ষাকৃত কম সাহায্য হয়। মোটামুটী একথা বলা যায়,

যে শিকড় দিয়া যাহা লয়, তাহা গাছের পানীয় ; শুধু জল পান করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় না ; জীবনের জন্য খাদ্যও প্রয়োজন। পানীয় সংগ্রহের জন্য গাছের শিকড় ; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য বৃক্ষলতাদির অন্য মুখ আছে। গাছের পানীয় ও তাহা সংগ্রহের উপায়ের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে কিছু বলিব ; আজ শুধু খাদ্য সংগ্রহের মুখের কথাই বলিতেছি।

মানুষের একটীই মুখ ; অন্যান্য জন্তুদের ও একটীই মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, যে কোনও কোনও সাপের দুইটী মুখ আছে। ছেলেবেলায় আমরা শুনিতাম, যে তাহারা এক মুখ দিয়া কামড়ায়, অন্য মুখ দিয়া সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলে, দেখ আমি কাহাকেও কামড়াইতেছি না। সেই জন্য দোমুখো সাপের বিষ কিছুতেই নামে না। গাছের কিন্তু একটী নয়, দুটি নয়, অসংখ্য মুখ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তাহাদের জলপান করিবার ও ভাত খাইবার ভিন্ন ভিন্ন মুখ। শুধু তাই নয়, ভাত খাইবার মুখও অসংখ্য। তোমাদের হয়ত বড় কৌতূহল হইতেছে "যে কই আমরা ত একটী মুখও দেখিতে পাই না, অসংখ্য মুখ কোথায় ?" সুতরাং কথাটা প্রথমেই বলিয়া ফেলি, তার পরে বুঝাইয়া দিব। গাছের

যে সব পাতা দেখিতে পাও, এইগুলি তাহাদের মুখ। এক একটী পাতায় সহস্র সহস্র মুখ আছে। যদি একটী পাতা হইতে একটী টুকরা কাটিয়া লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে তাহার উপরে এক স্তর জলময় কোষ রহিয়াছে; তাহার নিম্নে আর এক স্তর ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজ রংএর কোষ, তাহার নিম্নে স্পঞ্জের ন্যায় আরও এক স্তর। পাতার এই তিন স্তরকে গাছের মুখ, পাকস্থলী ও মল মূত্রাদি পরিত্যাগের যন্ত্র বলা যাইতে পারে। উপরের জলময় কোষ গুলি এক একটী মুখ। এই কোষগুলি প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডল হইতে গাছের দেহগঠনোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিতেছে। এই পুস্তকের প্রথমেই কয়লা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের স্মরণ থাকিবে, যে উদ্ভিদ্ শরীরের প্রধান উপাদান কার্ব্বন বা কয়লা। কার্ব্বনই বৃক্ষের প্রধান খাদ্য। এই কার্ব্বন বাষ্পাকারে বায়ুতে বর্ত্তমান আছে। উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্পীভূত কার্ব্বন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ ও শরীর গঠন করে। আমরা যেমন বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করি, উদ্ভিদেরা সেই প্রকার বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড

বাষ্প গ্রহণ করে। এখানে প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য বিনিময় নিয়ম দেখা যাইতেছে। জন্তুগণের পক্ষে যাহা জীবন-ধারণের উপায়, বৃক্ষদের পক্ষে তাহা বিষ ; আবার জন্তুদের পক্ষে যাহা বিষ, তাহা উদ্ভিদের প্রাণ। আমরা প্রতিনিয়ত নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করি ও প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহ মধ্য হইতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যাগ করি ; কারণ তাহা আমাদের জীবনের ঘোর অনিষ্টকারী। কিন্তু উদ্ভিদ সকল আমাদের পরিত্যক্ত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করিয়াই বাঁচে এবং আমরা তাহাদের পরিত্যক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করি। এইরূপে জন্তু ও উদ্ভিদ পরস্পরের জীবন রক্ষার সাহায্য করিতেছে। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদের আহার আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের ন্যায়। বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প রহিয়াছে। বৃক্ষপত্রের জলময় কোষগুলি প্রতিনিয়ত এই বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। তৎপরে এই বাষ্প পত্রের মধ্যে জীর্ণ হইয়া বৃক্ষদেহের উপাদান রূপে পরিণত হয়। আমরা মুখ দিয়া যে অন্ন গ্রহণ করি, তাহা পাকস্থলীতে শরীর রক্ষা ও গঠনের উপাদানে পরিণত হয়। বৃক্ষ পত্রও সেইরূপে গৃহীত কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পকে উদ্ভিদ দেহের উপাদানে পরিণত করে। পত্রের জলময় কোষের

নিম্নে যে সবুজ রঙ্গের কোষের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই কাজ এই গৃহীত বাষ্পকে জীর্ণ করা। সুতরাং দেখিতেছ, যে বৃক্ষপত্রের এই সবুজ অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহার নাম ক্লোরোফিল। এই সবুজবর্ণ ক্লোরোফিল সূর্য্যতাপের সাহায্যে বায়ু হইতে কার্ব্বনিক বাষ্প গ্রহণ ও তাহাকে জীর্ণ করিয়া বৃক্ষদেহের পুষ্টিসাধন করে। যখন পাতাগুলি বৃদ্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার সবুজ রং চলিয়া যায়। তাহার কারণ এই, যে পত্রের ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া গেলে পাতা আর কার্ব্বনিক এসিড জীর্ণ করিতে পারে না, সুতরাং তখন খাদ্যাভাবে পত্রটী ক্রমে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে।

আমরা সচরাচর মনে করি, গাছের পাতাগুলির বেশী কিছু কাজ নাই। কিন্তু তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ, যে বৃক্ষদেহের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাতাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। পাতাগুলি যেন সর্ব্বদাই হাঁ করিয়া আছে, বাতাস পাইলেই গিলিয়া ফেলিতেছে। যে গাছে যত বেশী সবুজ পাতা, তাহার জীবনী শক্তি তত অধিক। কিন্তু গাছের সুচারুরূপ পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধির জন্য পাতাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস লাগা প্রয়োজন, সেই জন্যই পাতাগুলি ডালের আগায় থাকে। তোমরা

বড় বড় গাছ গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে পাতাগুলি একটী ছাতাকে মেলিলে যেমন দেখায়, তেমনি করিয়া সাজান আছে। কোনও একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইলে দেখিতে পাইবে, পাতাগুলি একটীর নীচে অপরটী এরূপ ভাবে সাজান নাই ; কিন্তু সবগুলি পাশাপাশি সাজান। ডালের একদিক হইতে একটী পাতা উঠিয়াছে ; তার উপরের পাতাটী তাহার বিপরীত দিকে ; আর একটী পাতা এই দুইয়ের মাঝখানে। এইরূপ হইবার কারণ, যে তাহাতে একটী পাতা অপরের রৌদ্র ও বাতাসের পথ বন্ধ করে না। কেবল এইটুকু মনে করিয়া রাখ, যে গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন, যে পাতাগুলি রৌদ্র ও বায়ুপূর্ণ স্থানে থাকিবে। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ যে ছায়াযুক্ত স্থানের গাছ বাড়ে না ; পাতাগুলি কটা হইয়া যায়। তাহার কারণ, যে সেখানে পাতাগুলি যথেষ্ট সূর্য্যের তাপ এবং বাতাস পায় না ; খাদ্যাভাবে তাহার সবুজ রঙ্গের ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং গাছও বাড়ে না।

পাতার সবুজ রঙ্গের কোষের নীচে আর এক স্তর আছে। ইহার কাজ অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে পরিত্যাগ করা। উপরের জলময় স্তর বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প গ্রহণ করে। কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পে কার্ব্বন ও

অক্সিজেন এই দুই পদার্থ থাকে; তন্মধ্যে কার্ব্বনই বৃক্ষের প্রয়োজনীয়। মধ্য স্তরের কোষস্থ ক্লোরোফিল কার্ব্বন শুষিয়া লয় এবং সর্ব্ব নিম্ন স্তর দিয়া অপ্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও অন্যান্য পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা বাতাসভোজী গাছপালার কথা বলিতে-ছিলাম; কিন্তু এমন কোনও কোনও গাছ আছে, বাতাসে যাহাদের পেট ভরে না। তাহারা জানোয়ার ধরিয়া খাইতে চায়। পাতাই ইহাদের ও মুখের কাজ করে। তাহারা কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য পাতা দিয়া নানা রকমের ফাঁদ তৈয়ারি করিয়া রাখে। এক রকম গাছ আছে, তাহাদের পাতার গায়ে অনেক শোঁয়া থাকে; ঐ শোঁয়ার গায়ে আটার মত এক রকম জিনিষ থাকে। পোকা ও মাছি পাতার গায়ে বসিবা মাত্র আটাতে আটকাইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ শোঁয়া-গুলিও পোকার উপর নোয়াইয়া পড়ে, এবং তাহা হইতে জলের মত এক প্রকার জিনিস বাহির হইয়া পোকাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। উত্তর আমেরিকায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহার পাতাগুলি যেন কব্জা দিয়া আঁটা; পাতার উপরে মাছি বা পোকা বসিবা মাত্র পাতাটী বেশ শক্ত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। পোকা আর কোনও রকমে বাহির হইতে পারে না। তার পরে সেই পোকা জীর্ণ হইয়া গেলে

আপনিই পাতা খুলিয়া যায় এবং আবার নূতন পোকার আশায় বসিয়া থাকে। তোমাদের মধ্যে যাহারা শিবপুরের কোম্পানির বাগানে গিয়াছ, তাহারা সেখানে Pitcher plant (কলসী গাছ) নামে এক প্রকার গাছ দেখিয়া থাকিবে। ইহার প্রত্যেকটী পাতার আগাতে যেন ছোট একটী কলসী আছে। এগুলিও পোকা ধরিবার ফাঁদ। পোকা ও মাছিকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য এগুলি আবার নানা রঙ্গে চিত্রিত। এই সকল কলসীর গায়ে মধুর মত এক রকম মিষ্টি জিনিস থাকে। মধুর লোভে আকৃষ্ট হইয়া পোকারা ক্রমশঃ কলসীর ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে শেষে তাহার মধ্যে যে জলের মত পদার্থ থাকে তাহাতে ডুবিয়া যায় এবং সেখানে জীর্ণ হইয়া গাছের আহার যোগায়। গাছের খাবার সম্বন্ধে মোটামুটী তোমাদিগকে এই কয়েকটী কথা বলিলাম। তোমরা যখন বড় হইয়া অনেক পড়িবে, তখন দেখিবে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কি আশ্চর্য্য জ্ঞানলীলাই খুলিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যে আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল আছে, তাহা জানিলে বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া যায়। *

---

* ইহা ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের মুকুলে প্রকাশিত হয়।

গাছের জন্ম।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে গাছের পা ও গাছের মুখের কথা বলিয়াছি। তোমরা শুনিয়াছ, যে গাছ ও মানুষের মত আহার গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। জীবন বলিলেই জন্মের কথা আসে। গাছের জন্ম হয় কি করিয়া? তাহাদের কি মা বাপ আছে? তোমাদের মনে হয়ত এই প্রশ্ন আসিতেছে। গাছের জন্মের কথা অতি আশ্চর্য্য। তোমরা সকলেই জান, যে বীজ হইতে গাছের জন্ম হয়। তোমরা ইহাও জান যে পেঁয়াজ, কলা, রজনীগন্ধা ফুলের গাছ প্রভৃতি অনেক রকম গাছের গোড়ায় কোষ থাকে সেইগুলি হইতে আবার নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। এমন অনেক গাছ আছে যাহার ডাল কাটিয়া মাটীতে পুতিলেই সেটী লাগিয়া নূতন গাছ হয়। তোমরা যখন বড় হইবে, তখন সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক পড়িবে। কেমন করিয়া একটী জীবন হইতে অপর একটী জীবনের উৎপত্তি হয় তাহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সকল রকমের জীবেরই এক প্রকারে জন্ম হয় না। মানুষ, গরু ভেড়া প্রভৃতির

ছানা হয়। পাখী, মাছ প্রভৃতির ডিম হইতে নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ হয়ত জান, যে এমন কোনও কোনও জন্তু আছে যাহাদিগকে কাটিয়া দুই ভাগ করিলে এক একটী ভাগ এক একটী নূতন জন্তু হইয়া যায়। কেবল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন্তুরই এই প্রকারে জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ নাই। কিন্তু সকল প্রকার উচ্চশ্রেণীর জীবেরই স্ত্রী ও পুরুষ আছে। উদ্ভিদের মধ্যে এই সকল প্রকারের জীব সৃষ্টির নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাহাদিগকে কাটিয়া দুই খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড এক একটী নূতন গাছ হয়। বেল ফুলের ডাল কাটিয়া মাটীতে পুঁতিয়া দিলে তাহা হইতে নূতন গাছ হয়, তাহা ত তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কলা গাছের শিকড় হইতে যে নূতন গাছ বাহির হয়, তাহা অনেক পরিমাণে এই প্রকারের। এখানে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নাই। সব গাছ হইতেই নূতন গাছ জন্মাইতে পারে।

কিন্তু বীজ হইতে যে সব গাছ হয়, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ আছে। সে সব গাছের উৎপত্তির জন্য মা ও বাপ উভয়েরই প্রয়োজন হয়। তোমরা হয় ত শুনিয়াছ

যে তাল গাছের মধ্যে এক একটীকে পুরুষ তাল গাছ বলে। তাহাদের তাল হয় না, শুধু জটা হয়।

কিন্তু সচরাচর স্ত্রী ও পুরুষ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন না থাকিয়া একত্রে একটী গাছেই থাকে। একটী গাছে অনেকগুলি পুরুষ ও অনেকগুলি স্ত্রী থাকে। ফুল গুলিই সেই পুরুষ ও স্ত্রী। ফুল হইতে ফল অথবা বীজ জন্মে এবং সেই বীজে নূতন গাছ হয়। বীজ গুলি ঠিক এক একটী ডিমের মত। তবে পাখী নিজেই ডিমে তা দেয়; কিন্তু গাছের ডিমে গাছ নিজে তা দেয় না; তা দেওয়ার কাজ জমিতে করে। গাছ ডিম ছাড়িয়াই নিষ্কৃতি পায়; ডিমগুলি যখন পরিপক্ক হয়, তখন আপনা হইতেই মাটীতে পড়িয়া যায়; কোনও স্থলে বা তাহাদের উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্তও আছে। "গাছের পা" নামক গল্পে সে কথা বলিয়াছি। মাটীতে বীজ পড়িলে মাটী তাহাদিগকে ঢাকিয়া দেয়; তখন ডিম ফুটিয়া নূতন অঙ্কুর হয়। ডিম কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ? ডিম হইল বীজগুলি। এক একটী বীজ এক একটী ডিম। আর ফুলগুলি হইল তাদের মা বাপ। কোন কোনটী ফুল মা, কোন কোনটী ফুল বাপ। যাঁহারা উদ্ভিদবিদ্যায় পণ্ডিত অর্থাৎ যাঁহারা গাছ-পালার কথা সব জানেন,

তাঁহারা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারেন, কোন ফুলটী মা ও কোন ফুলটী বাপ। কিন্তু সাধারণতঃ মা ও বাপ পৃথক পৃথক ফুলে থাকে না। অধিকাংশ স্থলেই একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুইই থাকে। এক একটী ফুল যেন এক একটী পরিবার। ফুলের পরিবারটী কেমন তাহা তোমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন।

তোমরা ফুলের কুঁড়ি দেখিয়াছ। ফুলটী যতদিন না ফুটে, ততদিন তাহা সবুজ রঙের একটি আবরণের মধ্যে থাকে। সেটীকে ফুলের ঘর বলা যায়। সেই ঘরের মধ্যে ফুলের দলগুলি আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে। সেই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সামান্য গরম বা ঠাণ্ডা লাগিলেই শিশু ফুলটী মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, কীট পতঙ্গে ও তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে পারে, এই জন্য ভগবান তাহাকে সুন্দর করিয়া সবুজ রঙ্গের ঘরের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তার পরে ফুলটী বড় হইয়া যখন একটু সবল হয়, যখন শীত গ্রীষ্ম বা পোকা মাকড়ে সহজে তাহার কিছু করিতে পারিবে না এমন হয়, তখন সে কুঁড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু তখনও সেই সবুজ রঙের খোসাটী

বোঁটাটীর চারিদিক ঘেরিয়া থাকে। এই খোসাটীকে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে ক্যালিক্স, (Calyx) পুষ্পদলাবরণ বলে। তোমরা নামটী মনে করিয়া রাখিও; ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির বৈজ্ঞানিক নাম আছে; সেগুলির বাঙ্গালা নাম দেওয়া সকল সময় সম্ভবও নয় এবং সুবিধাও নয়। তোমরা কিন্তু সে নাম গুলিকে মনে করিয়া রাখিবে। এই ক্যালিক্স ফুলের শৈশব অবস্থায় তাহাকে রৌদ্র বৃষ্টি এবং শীত গ্রীষ্মের হাত হইতে রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, যখন ফুলটী বড় হয় তখনও তাহার অনেক শত্রু থাকে। ফুলের মধুর লোভে পিঁপড়া যাইয়া সেটীকে কাটিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তখন ক্যালিক্স তাহার পথ আটকাইয়া থাকে। তোমরা একটা ফুল তুলিয়া দেখিতে পার, যে তাহার বাহিরের সবুজ খোসার উপরে অনেক সূঁয়া আছে। পিঁপড়া বা অপর কোনও কীট তাহার উপর দিয়া যাইতে পারে না। এই সূঁয়াগুলি ফুল পরিবারের দ্বার রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে।

ক্যালিক্সের পরে ফুলের দলগুলি। সাধারণতঃ দলগুলিকেই আমরা আসল ফুল মনে করি। আমাদের নিকট এই বিচিত্র বর্ণের দলগুলির জন্যই ফুলের গৌরব।

কিন্তু সেগুলি কেবল বাহিরের সাজ সজ্জা মাত্র; সেগুলিকে ফুলের পোষাক বলা যাইতে পারে। সেগুলিরও কাজ আছে; সে কথা আমরা পরে বলিব। কিন্তু সেগুলি আসল ফুল নয়। আসল ফুল ফুলের ভিতরে যে সূতা বা সূঁয়ার মত জিনিস থাকে সেইগুলি। যদি একটী গোলাপের ফুল লইয়া তাহার দলগুলি খসাইয়া ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে তাহার ভিতরে সূতার মত কতকগুলি ডাঁটা বা সূঁয়া দেখিতে পাইবে; সেইগুলির মাথায় পরাগ বা ফুলের রেণু থাকে। মধুমক্ষিকা সকল ইহারই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আসে। এই গুলির নাম ষ্টেমেন্স বা পরাগ কেশর; মোটামুটি এ গুলিকে তোমরা ফুলের বাবা বলিয়া মনে রাখিতে পার। কোন কোনও ফুলে তিনটী, কোনও ফুলে পাঁচটী, অথবা ছয়টী এবং দশটী বা অসংখ্য ষ্টেমেন্স থাকে। এই ডাঁটাগুলির মাথাতে এক একটী থলিয়া আছে। তাহা হইতে ফুলের রেণু বাহির হয়। ষ্টেমেন্স গুলিও অপেক্ষাকৃত বাহিরের অংশ; ইহার পরে থলির মত আর একটী অংশ থাকে তাহার নাম পিষ্টিল (pistil) অথবা গর্ভ কেশর; এই পিষ্টিল একেবারে ফুলের কেন্দ্র; ইহার নীচের অংশ স্ফীত এবং উপরের অংশ হইতে অনেক বড়। ইহাকে ভিতর কোষ বলে।

ইহার মধ্যে ফুলের বীজের ভ্রূণ থাকে। তাহাকে ওভিউল বলে। ওভিউল কথার অর্থ ক্ষুদ্র ডিম্ব। ওভিউলটী এক বা ততোধিক পত্রের ন্যায় আবরণে আবৃত থাকে। পিষ্টিলটীকে মোটামুটি বীজের মা বলা যাইতে পারে। সুতরাং ফুল পরিবারে পিষ্টিল ও ষ্টেমেন স্ত্রী ও পুরুষ। এই স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে বৃক্ষশিশুর অর্থাৎ বীজের জন্ম হয়। ষ্টেমেনের রেণু যখন পিষ্টিলের ওভিউলের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন তাহাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। যদি পিষ্টিলের ওভিউলে ষ্টেমেনের রেণু মিশ্রিত না হয়, তাহা হইলে বীজে প্রাণ সঞ্চার হয় না, তাহা শুকাইয়া যায়। যাহাতে বিনা বিঘ্নে বীজের দেহে জীবন-সঞ্চার হইতে পারে, প্রকৃতি মাতা তাহার জন্য অতি আশ্চর্য্য কৌশল স্থাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে এমনও গাছ আছে, যাহাতে স্ত্রী এবং পুরুষ অর্থাৎ পিষ্টিল এবং ষ্টেমেন ভিন্ন ভিন্ন ফুলে বাস করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে তাহারা এক ফুলেই থাকে।

তথাপি সচরাচর এক ফুলের ষ্টেমেন দ্বারা তাহার ওভিউলে জীবন সঞ্চার হয় না। যেমন মানব সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, এক পরিবারের পুত্রকন্যাগণের

মধ্যে বিবাহের নিয়ম নাই, এক পরিবারের পুত্রের সহিত অপর কোনও পরিবারের কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে; ফুলের রাজ্যেও সেই নিয়ম। একটী ফুলের ষ্টেমেনের সহিত অপর ফুলের পিষ্টিলের বিবাহ হয় এবং তাহাতে বৃক্ষ শিশুর জন্ম হয়। আজ কেবল তোমাদিগকে গাছের জন্মের কথাই বলিলাম। বারান্তরে গাছের বিবাহের কথা বলিব।

রেশমের চাষ।

বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের যে সব শিল্প কার্য্য লোপ পাইতেছে তাহার মধ্যে রেশমের চাষ একটী প্রধান। ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল হইতে রেশমের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে রেশমের চাষের আয়তন সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, বিদেশীয় রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ফ্রান্স, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশ অপেক্ষা স্থলভে রেশম প্রস্তুত হইতেছে; বাজারে লোকে এখন অল্প মূল্যে বিদেশী রেশম কিনিতে পাইতেছে, তাই দেশীয় রেশমের কাটতি কমিয়া যাইতেছে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, অন্যান্য দেশে যে উপায়ে স্থলভে ভাল রেশম প্রস্তুত করা হয়, আমাদের দেশে সেই সকল উপায়ের প্রচলন। আমাদের দেশে রেশমের চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক স্থবিধা আছে। বিগত কয়েক শত বৎসর মধ্যে অন্যান্য দেশে রেশমের চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের চাষীরা এখনও সেই প্রাচীনকালের প্রথা সকলই ধরিয়া আছে,

তাই তাহারা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না। আমাদের দেশের চাষীরা ত জানে না কোন দেশে কি উপায়ে রেশম প্রস্তুত করে। যদি কোনও দেশ-হিতৈষী লোক অন্যান্য দেশে প্রচলিত উৎকৃষ্ট প্রথা আমাদের দেশের চাষীগণকে শিখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের রেশমের চাষ রক্ষা পায়। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ জে, এন, তাতা, এই কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। তিনি ব্যাঙ্গালোরের নিকটে একটী আদর্শ রেশমের কুঠী খুলিয়া-ছিলেন। জাপান হইতে একজন অভিজ্ঞ রেশম ব্যবসায়ী আনাইয়া তাঁহার হাতে এই আদর্শ কুঠীর ভার দিয়া-ছিলেন। আমি সেই রেশমের কারখানায় যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারই বিবরণ আজ তোমাদিগকে বলিব।

বার বার রেশমের "চাষ" এই কথা ব্যবহার করিতেছি। তাহা হইতে তোমরা হয়ত মনে করিবে, রেশম ক্ষেতে জন্মে। সাধারণতঃ তিনটী পদার্থে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ তূলা, দ্বিতীয়তঃ ছাগল বা ভেড়ার লোম, তৃতীয়তঃ রেশম। ইহাদের মধ্যে রেশমের ব্যবহারই সকলের শেষে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ তূলা বা ভেড়ার লোম যেমন সহজে পাওয়া যায়, রেশম তেমন সহজে পাওয়া যায় না। রেশম প্রস্তুত করিতে অনেক বুদ্ধি এবং

পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই জন্য মানব জাতি সভ্যতার সোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে চীনদেশে রেশমের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেজন্য সংস্কৃতে রেশমের নাম চীনাংশুক। চীন হইতে ভারতবর্ষে রেশমের চাষ প্রচলিত হয়, এবং ক্রমে তথা হইতে পারস্য, আরব এবং ইউরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

রেশমের চাষ এই কথা ব্যবহার করিতেছি বটে, কিন্তু রেশম জমিতে জন্মে না, ইহা এক প্রকার পোকা হইতে পাওয়া যায়। এই পোকার খাবারের জন্য এক প্রকার পাতা লাগে, তাহা জমিতে হয়; রেশম প্রস্তুত করিতে এই পাতার খুব প্রয়োজন; ইহাকে পাত বা তুত বলে। তুতের গুণের তারতম্য অনুসারে রেশমের গুণের তারতম্য হয়। রেশমের কাজ করিতে হইলে তূতের চাষের প্রয়োজন। সেইজন্য রেশমের চাষ এই কথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। রেশমের পোকাগুলি ডিম হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে খাবার দিতে হয়। তূতের পাতাগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ডালাতে রাখিয়া তাহাতে পোকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। পোকাগুলির কি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা। খাইবার জন্যই ইহাদের জন্ম। আর কোনও কাজ নাই, দিন রাত্রি

খাইতেছে। প্রতিদিন নূতন নূতন পাতা দেওয়ার এক সুন্দর কৌশল আছে। একদিন যে ডালিতে খাইল, সে দিনের মধ্যেই তাহা অপরিষ্কার করিয়া ফেলে, শুখনা পাতার অবশিষ্টাংশও কিছু পড়িয়া থাকে, সুতরাং সেই ডালির উপর আর নূতন পাতা ঢালিলে চলে না। রেশমের পোকাগুলিকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগকে খুব যত্ন করিয়া রাখিতে হয়; পোকার অনেক রকম পীড়া আছে, পাতা যদি খারাপ হয়, তবে পোকা ভাল হয় না; বিশেষ রকমের সার দিয়া তবে পাতার গাছ তৈয়ার করিতে হয়। যাহারা রেশমের কাজ করে, তাহারা পোকার এই সকল রোগ ও তাহার প্রতীকারের উপায় জানে। যাহা হউক, যে কথা বলিতে-ছিলাম, একখানি ডালায় পাতা ফুরাইয়া গেলে আবার নূতন পাতা দিবার সময় সেই ডালির উপরে একখানি জাল বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর নূতন পাতা ছড়াইয়া দিবামাত্র সব পোকাগুলি জালের ভিতর দিয়া উপরের নূতন পাতাগুলির উপর আসিয়া পড়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমুদয় পোকা জালের উপরে আসিয়া পড়ে; তখন জাল শুদ্ধ সেগুলিকে অন্য একটী ডালিতে রাখা হয়। পোকাগুলির খাবার আগ্রহ দেখিলে হাসি পায়। তাহারা এত খাইতে পারে;

খাওয়ার যেন বিরাম নাই। খাইয়া খাইয়া দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠে। যখন ডিম হইতে বাহির হয়, তখন পোকাগুলি সূতার মত সূক্ষ্ম থাকে, কয়েক দিনের মধ্যেই খাইয়া খাইয়া তাহারা বড় হইয়া উঠে। যাহারা রেশমের কাজ করে, তাহারা দেখিয়াই বলিতে পারে, কোন পোকাটী কত দিনের। সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়ত্রিশ দিন ইহারা পোকার অবস্থায় থাকে। এই পঁয়ত্রিশ দিনই ইহাদের খাওয়ার সময়। পঁয়ত্রিশ দিন পরে আর খায় না, তখন তাহারা বিশ্রাম করে। এই সময়ে তাহারা লালা দ্বারা আপনাদের জন্য এক প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করে। মাকড়সা যেমন শরীর হইতে নিঃসৃত রস দিয়া জাল নির্ম্মাণ করে, রেশমের পোকাও তেমনি শরীরের রস দিয়া আপনাদের বাসা করে। তবে তাহাদের বাসা তাহারা আপনাদের শরীরের চারিদিকেই করে। লাল দিয়া আপনাদের শরীরের চারিদিক ঘিরিতে থাকে, ক্রমে পোকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তার পরিবর্ত্তে ছোট একটী ঠোঙ্গা দেখা যায়। তোমরা হয়ত অনেক সময় গাছে এই প্রকার ঠোঙ্গা দেখিয়াছ। পোকাগুলি সাধারণতঃ এই ঠোঙ্গার মধ্যে দশ বা বারো দিন থাকে। তৎপরে ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হয়। কিন্তু যখন বাহির হয়, তখন সে আর পোকা থাকে না, সুন্দর প্রজাপতির

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসে। লম্বা পোকাটী কি করিয়া প্রজাপতি হইয়া গেল, তাহা জানি না; সবুজ রঙ্গের পোকা শুভ্র প্রজাপতির রূপ ধারণ করে, তাহার দুইখানি পাখা, পা, মাথায় শিখা; আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কোনটী পুরুষ প্রজাপতি, কোনটী স্ত্রী প্রজাপতি। রেশম ব্যবসায়ীরা দেখিলেই বলিতে পারে, কোন্‌টী পুরুষ, কোন্‌টী স্ত্রী। অভিজ্ঞ কৃষকেরা পোকা অবস্থাতেও কোনটী পুরুষ, কোন্‌টী স্ত্রী বলিতে পারে। প্রজাপতি অবস্থায় কিন্তু তাহাদের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হইবার কয়েক ঘণ্টা 'পরেই তাহাদের মৃত্যু হয়। স্ত্রী প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়, পুরুষগুলি তাহারও পূর্ব্বে মরে।

রেশম লইতে হইলে প্রজাপতি'ক ঠোঙ্গা কাটিয়া বাহির হইবার অবসর দেওয়া হয় না। ঠোঙ্গা কাটিলে রেশমের সূতা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। সমস্ত ঠোঙ্গাটা এক গাছি সূতাতে নির্ম্মিত। যদি তাহার কোথাও একটু ছিদ্র হয়, তবে সূতাগাছি কাটিয়া যায়। সেইজন্য ঠোঙ্গা কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইবার দুই একদিন পূর্ব্বে ঠোঙ্গাগুলিকে গরম জলে বা বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তারপরে ঠোঙ্গাগুলিকে গরম জলে ভিজাইয়া সূতার মুখ ধরিয়া টানিলে সূতা উঠিয়া আসে; এক রকম কল আছে, তাহাতে চরকা থাকে, চরকাতে

সূতার অগ্রভাগ বাঁধিয়া দেওয়া হয়, চরকা যেমন ঘুরিতে থাকে গুটী হইতে সূতা বাহির হইয়া চরকায় জড়াইয়া যায়। এক একটী গুটী হইতে সাধারণতঃ এক হাজার হাত রেশম বাহির হয়। এখন বুঝিতে পারিতেছ, যে রেশম ঐ গুটী পোকাগুলির শরীরের রস ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাকড়সার শরীরের রস হইতে যেমন তাহাদের জালের সূতা হয়, তেমনি গুটী পোকার শরীরের রস হইতে রেশম হয়; কিন্তু মাকড়সার সূতা সহজে ছিঁড়িয়া যায়, গুটীপোকার সূতা সূক্ষ্ম অথচ খুব শক্ত, এবং দেখিতে উজ্জ্বল ও মসৃণ। সেই জন্যই উহার এত আদর এবং মূল্য।

সব ঠোঙ্গাগুলি সিদ্ধ করিয়া রেশম লইলে পোকার বংশ লোপ পাইয়া যাইত। এই জন্য সব ঠোঙ্গা সিদ্ধ করা হয় না। প্রয়োজন মত কতকগুলি ঠোঙ্গা রাখিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি কাটিয়া পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাপতি বাহির হয়। বাহির হইবার আট দশ ঘণ্টা পরেই স্ত্রী প্রজাপতি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এক একটী প্রজাপতি প্রায় দুই শত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, তোমরা পিঁপড়ের ডিম দেখিয়া থাকিবে। রেশমের পোকার ডিম তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি মরিয়া যায়, আর কিছু করিতে হয়

না। দশ বার দিন পরে আপনা হইতেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

গৃহপালিত প্রজাপতিগুলি উড়িতে পারে না। বোধ হয়, অনেক খাইয়া তাহাদের শরীর এত মোটা হয়, যে তাহাদের ছোট পাখা সে দেহের ভার বহন করিতে পারে না; স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে হয় ত তাহারা উড়িতে পারিত! তখন হয়ত তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। পোষা প্রজাপতিগুলি কিন্তু আট দশ ঘণ্টা বই বাঁচে না। বিলাসী লোকের সাজ সজ্জার উপকরণ দিবার জন্যই কি তাহাদের জন্ম, না তাহাদের জীবনে আর কোনও কাজ আছে?

শূন্যপথ ভ্রমণ।

আকাশ পথে যাতায়াতের কথা অনেকদিন হইতে শুনা যাইতেছে। জল ও স্থলে মানুষের অবাধ গতি হইয়াছে। আকাশে কেবল বাকী ছিল মানুষের যেন তাহা সহিতেছিল না। অনেক দিন হইতে মানুষ আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানুষ আকাশে উড়িবার কত চেষ্টা করিয়াছে তাহার বিবরণ "মুকুলে" প্রকাশ করা হইয়াছিল। এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আকাশ ভ্রমণের চেষ্টায় বড় কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশ্য বেলুন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মানুষ আকাশে উঠিতে পারে, কিন্তু বেলুনকে যথা ইচ্ছা চালান যায় না। তাহা বাতাসের বেগে যেদিক সেদিক উড়িয়া যায়। মানুষ শুধু আকাশে উঠিয়া ক্ষান্ত নহে। মানুষ চায়, যে, যেমন মাটীর উপরে ঘোড়ার গাড়ী চালাইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যায়, আকাশেও তাহাই করে। গত দশ বৎসরে এই চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। আকাশে বেড়ান এখন আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। এমন কি, এখন আকাশে যুদ্ধের কথাও হইতেছে; এবং

সকল পরাক্রান্ত জাতিই তাহার আয়োজন করিতেছে। সকল দেশেই যেমন যুদ্ধের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করা হয়; তেমনি যুদ্ধের জন্য বেলুন নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। একবার যদি আকাশ হইতে যুদ্ধের বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে মহা পরিবর্ত্তন হইবে। তখন দুর্ভেদ্য দুর্গ, অসংখ্য সৈন্য, মহা পরাক্রান্ত নৌসেনা রাখিয়াও কোনও দেশ নিরাপদ হইবে না। কারণ একবার যদি বেলুনে উঠিয়া আকাশ হইতে দুর্গের ভিতরে কি সৈন্যদের মাঝখানে কয়েকটা বোমা ফেলিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলেই কাজ শেষ হইবে। এখনকার বোমা এমন ভয়ঙ্কর হইয়াছে, যে কয়েকটা বোমাতেই প্রকাণ্ড সৈন্যদল বিনষ্ট হইতে পারে। আকাশে যুদ্ধের এই সুবিধা দেখিয়া জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আকাশ ভ্রমণের উপযোগী বেলুন প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। জার্ম্মাণীর কাউণ্ট জেপেলিন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বহু চিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া একপ্রকার বেলুন প্রস্তুত করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। কাউণ্ট জেপেলিন তাঁহার বেলুনে ফ্রেডরিক-সাফেন হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট পর্য্যন্ত ২০০ মাইল ১২ ঘণ্টায় গমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রাইট ব্রাদার্স নামে

এক ব্যবসায়ী দলও নানা প্রকারের বেলুন প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্লেরিও নামক একজন ফরাসী এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি যে বেলুন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছাক্রমে এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বেলুনে চড়িয়া তিনি ইংলিশ চেনেল পার হইয়া শূন্যপথে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ডেলী মেল ঘোষণা করিয়াছিল, যে কেহ শূন্যপথে ইংলিস চেনাল পার হইতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। ব্লেরিও তাঁহার আবিষ্কৃত বেলুনে ক্যালে হইতে ডোভারে আসিয়া সেই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ল্যাথাম নামক আর একজন লোক শূন্য পথে ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ল্যাথামের বেলুন দুই তিন মাইল আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্লেরিওর বেলুনে কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। তিনি প্রত্যুষে ৪॥ টার সময় ক্যালে নগর পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপথে ৪৫ মিনিটে ডোভারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বেলুন ঘণ্টায় ৪২॥ মাইল বেগে গিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একখানি দ্রুতগামী ষ্টীমার যাইতেছিল;

দৈববশাৎ যদি বেলুন সমুদ্রে পড়িয়া যায়, তখন তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এই দ্রুতগামী ষ্টীমার তাঁহার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্লেরিওর বেলুন, ষ্টীমার পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ডোভারের উপকূলে তাঁহার একজন বন্ধু নামিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা নাড়িতেছিলেন। ব্লেরিও পতাকা দেখিয়া সেইখানেই তাহার বেলুন থামাইলেন। ব্লেরিও শূন্যপথে ইংলিশ চ্যানাল পার হইয়াছেন শুনিয়া ইউরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মহা সমারোহ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী পর্য্যন্ত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্লেরিওর বয়স এখন ৩৭ বৎসর মাত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আকাশ ভ্রমণের বাতিক ছিল। আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি কতবার যে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই; তবুও তিনি নিরস্ত হন নাই। অবশেষে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আকাশ ভ্রমণে যে সকল প্রতিবন্ধক ও বিপদ আছে তাঁহার বেলুনে সে সমুদয়েরই প্রতিবিধান করা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক পাখার মত তাহার পাখা আছে, সেই পাখার জোরে বেলুন চলে। পাখা মিনিটে ১২০০ বার ঘোরে, এবং তাহার জোরে এত

বেগ হয়, যে বেলুন ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মাইল বেগে চলে। তাহাকে ইচ্ছামত যেদিকে সেদিকে ঘুরাইবার বন্দোবস্ত আছে। এতদিনে বুঝি মানুষের জল স্থলের মত অবাধে শূন্যে বেড়াইবার উপায় আবিষ্কৃত হইল।

ইহা ১৩১৬ সালের মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেলির ধূমকেতু।

একদিন আমাদের নীতি বিদ্যালয়ের একটী ছেলেকে বলিয়াছিলাম,—"কি হে, ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিলে ?" সে বেচারী কিছু অপ্রতিভ হইল বটে; কিন্তু কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হইল না। ছেলেটি নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে আসিত না। এক রবিবার আসিল, তারপরে দুই তিন রবিবার দেখা নাই; আবার আর একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইজন্য তাহাকে ধূমকেতু বলিয়াছিলাম। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যে সমুদয় জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের গতিবিধি নিশ্চিত; রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইলে একই নক্ষত্রকে প্রতিদিনই দেখিতে পাইবে; যে নক্ষত্রকে দুই হাজার কি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেকালের ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, আমরাও তাহাকেই দেখিতেছি। কিন্তু আর এক প্রকারের জ্যোতিষ্ক আছে, যাহা কখনও দুই দশ দিনের জন্য দেখা দেয়, তারপর কোথায় চলিয়া যায় কতকাল আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এইগুলিকে ধূমকেতু বলে। এরূপ জ্যোতিষ্কের

সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; ক্বচিৎ কখনও দুই একটী আমাদের দৃষ্টিপথে আসে। সম্প্রতি আমাদের আকাশে এইরূপ একটী জ্যোতিষ্ক দেখা যাইতেছে। তাহার নাম "হেলির ধূমকেতু"। এটির নাম 'হেলির ধূমকেতু' কেন হইল তাহা পরে বলিতেছি। ইতিমধ্যে * তোমরা কিন্তু ইহাকে দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিবে, অল্পদিনের মধ্যেই ইহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে, বহু বৎসর পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিবে না; সুতরাং এখন না দেখিলে অনেকের পক্ষে এটিকে আর দেখা ঘটিবে না। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আরও পঁচাত্তর বৎসর বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলে আবার হেলির ধূমকেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে। প্রতি পঁচাত্তর বৎসরে এটী আমাদের এই পৃথিবীর নিকটে আসে। রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া পূর্ব্ব আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তোমরা ইহাকে দেখিতে পাইবে। এতদিন পর্য্যন্ত দূরবীণ না হইলে দেখা যাইত না, কিন্তু ইহা এখন আমাদের এত নিকটে আসিয়াছে যে এখন শুধুচোখেই দেখা যায়। ২১শে মে হেলির ধূমকেতু আমাদের এই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসিবে। কিন্তু তখনও ইহা পৃথিবী হইতে দশ কোটী মাইল দূরে থাকিবে।

---

* ইহা ১৩১৭ সালের লেখা; তখন হেলির ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল।

ধূমকেতুগুলি যে কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহাদের আয়তন অতি দীর্ঘ এবং প্রচণ্ডবেগে তাহারা আকাশ-পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের পশ্চাতের দিক দীর্ঘ লেজের মত বোধ হয়; সমস্ত ধূমকেতুটিকে একগাছি প্রকাণ্ড ঝাঁটার মতও মনে হয়। এইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীনকালের লোকেরা ধূমকেতুকে ঝাঁটাতারাও বলিতেন। ধূমকেতুর লেজ কিন্তু সকল সময় থাকে না; কখনও ছোট হয়, কখনও বড় হয়, কখন বা একেবারেই অদৃশ্য হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই লেজ এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থের সমষ্টি, সূর্য্যের আলোকে ইহা উজ্জ্বল হয়। এক একটী ধূমকেতুর লেজ বহু লক্ষ মাইল বিস্তৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হেলির ধূমকেতু এবার যখন আমাদের পৃথিবীর নিকট আসিবে, তখন আমাদের পৃথিবী তাহার লেজের সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবে। কিন্তু সে পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে, আমরা তাহা অনুভবও করিতে পারিব না। তাহা আমাদের বায়ু অপেক্ষাও তরল; বায়ুই যখন আমরা দেখিতে পাই না, তখন তাহা কি করিয়া দেখিতে পাইব। হেলির ধূমকেতুর লেজে কোনও বিষাক্ত পদার্থ নাই, সুতরাং কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় লোকের মনে ধূমকেতুর সম্বন্ধে এক প্রকার কুসংস্কার আছে। ধূমকেতু দেখিলেই কোনও প্রকার বিপদ আশঙ্কা করে। এই ভয় সম্পুর্ণ অমূলক। নূতন একটা কিছু দেখিলেই অশিক্ষিত লোকের তৎসম্বন্ধে একটা অজ্ঞাত ভয় হয়; সেই সময়ে যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অমনি মনে করে যে, ঐ নূতন জিনিসই বিপদের কারণ। ধূমকেতুর দুর্নামও এই প্রকারে হইয়াছে। ধূমকেতুর উদয় সর্ব্বদা হয় না। যখন ধূমকেতু দেখা যায়, স্বভাবতঃই মানুষের মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে যদি কোনও বিশেষ বিপদ উপস্থিত হয়, লোকে মনে করে ধূমকেতুর জন্যই তাহা হইয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকবার ধূমকেতুর উদয়ের সঙ্গে এক একটী বিপৎপাত হইয়াছিল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণ্ডির রাজা উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ধূমকেতু দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। যে বৎসর রোমান্ সৈন্যেরা জেরুশিলম নগরী ধ্বংস করে, সে বৎসরও ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ধূমকেতুর সঙ্গে বিপৎপাতের কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না। কতবার ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, কিন্তু কোনও বিপদ হয়

নাই। এই হেলির ধূমকেতুই কতবার দেখা গিয়াছে; কখনও কখনও সেই সঙ্গে আমাদের পৃথিবীতে কোথাও বিপদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার কতবার বিপদ হয় নাই।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে হেলির ধূমকেতুর ইতিহাসের কথা উঠিতেছে। আমি বলিলাম যে, হেলির ধূমকেতু অনেকবার আমাদের পৃথিবীতে দেখা গিয়াছে, এ কথা সত্য। বহু প্রাচীনকালে চীন, জুডিয়া, মিশর এবং ইউরোপের নানা স্থানে এই ধূমকেতুর উদয় লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ধূমকেতু যে একই তাহা লোকে তখন বুঝিতে পারে নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের আকাশে একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু লক্ষিত হয়। অন্যান্য লোকের সঙ্গে এড্‌মণ্ড হেলি নামক একজন তরুণ জ্যোতিষী তাহা লক্ষ্য করেন। হেলির বয়স তখন সাতাশ বৎসর মাত্র। হেলি পড়িয়াছিলেন যে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল; ১৫৩১ খৃষ্টাব্দেও একটি ধূমকেতুর উদয়ের কথা তৎকালীন পুস্তকাদিতে লিখিত ছিল। হেলি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এই দুইবারেই ঠিক পঁচাত্তর বৎসর অন্তর ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করিলেন যে, এই তিনটি ধূমকেতুই

এক; পঁচাত্তর বৎসরে তাহা সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত হয়। ধূমকেতুর গতিবিধি যে গণনা দ্বারা জানা যায়, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই ভাবেন নাই। জ্যোতিষীরা মনে করিতেন ধূমকেতু লক্ষ্যহীন জ্যোতিষ্ক; গ্রহ উপগ্রহের মত তাহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ নাই। একবার দেখা দিয়া সোজা চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। হেলি যখন বলিলেন যে, ধূমকেতুরও গ্রহের মত নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ আছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কক্ষপথ ভ্রমণ করিয়া তাহারা পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসে, তখন লোকে প্রথমে তাহা বিশ্বাস করে নাই। সে সময়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটন জীবিত ছিলেন। হেলি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার আবিষ্কারের কথা বলিলেন। হেলি বলিলেন,—পঁচাত্তর বৎসর পরে আবার এই ধূমকেতু দেখা যাইবে। অনেকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন, অনেকে করিলেন না। কিন্তু ১৭৫৯ সালের মার্চ্চ মাসে যখন আবার আকাশে সেই উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা গেল, তখন আর সন্দেহ করিবার উপায় থাকিল না। হেলির কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তদবধি তাঁহার নামানুসারে এ ধূমকেতু "হেলির ধূমকেতু" (Halley's Comet) নামে অভিহিত হইয়াছে। ৭৫ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে আবার

হেলির ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, এবারেও ৭৫ বৎসর পরে তাহাকে দেখা যাইতেছে। জ্যোতিষীরা এখন তাহার কক্ষপথ এবং তৎসম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য অবগত হইয়াছেন। প্রাচীন ইতিহাস হইতে এই ধূমকেতুর একুশবার উদয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮৭ খৃষ্টাব্দে রোমে যে এই ধূমকেতুই দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের জন্মের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে একটী ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল; চীনদেশের ইতিহাসে তাহার কথা লিখিত আছে। বর্ত্তমান কালে জ্যোতিষীরা মনে করেন সেটিও এই হেলির ধূমকেতু। তখন হইতে প্রতি পঁচাত্তর বৎসর অন্তর ইহা আমাদের পৃথিবীর নিকট আসিয়াছে। কোনও না কোনও দেশের ইতিহাস বা সাহিত্যে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই এখন আমরা হেলির ধূমকেতু দেখিতেছি; আবার ১৯৮০ সালে এটি ফিরিয়া আসিবে। ততদিন আমাদের অধিকাংশই এখান হইতে চলিয়া যাইব। তোমরা অবশ্য অবশ্য ভোরে উঠিয়া এটিকে দেখিয়া লইও। আর বেশী দিন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

ইহা ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসের মুকুলে প্রকাশিত হয়।

সত্যযুগের মানুষ।

অনেক দেশেই লোকের বিশ্বাস ছিল, যে অতি প্রাচীন কালে মানুষ জ্ঞানে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার পরে ক্রমে অবনতি হইতে হইতে বর্ত্তমান সময়ের হীন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে পুরাণে বলে, যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ। সত্যযুগে মানুষ পূর্ণ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ছিল, ত্রেতাযুগে তিন ভাগ ধর্ম্ম ছিল, দ্বাপরে দুই ভাগ; আর এখন কলিযুগে এক ভাগ মাত্র ধর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান সেই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। বিজ্ঞান বলিতেছে, যে মানুষের ক্রমে অবনতি না হইয়া উন্নতি হইয়াছে। যে সকল জাতিকে আমরা এখন সভ্য শিক্ষিত দেখিতেছি, প্রাচীনকালে তাহারা অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল। এমনি সময় ছিল, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না, বনের ফল বা কাঁচা মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত, পর্ব্বতের গুহায় বা বৃক্ষের কোটরে বাস করিত। সেকালের মানুষ এবং কোনও জন্তুতে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। বিজ্ঞান-বিদেরা বলেন যে, মানুষ এবং বানর একই শ্রেণীর প্রাণী।

আদিমকালের মানুষ দেখিতে প্রায় বানরের মতই ছিল। কিন্তু মানুষ এবং বানর যদি একই শ্রেণীর হয়, এবং এক কালে তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য ছিল না এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সে বহু প্রাচীনকালের কথা।

সম্প্রতি ইউরোপের নানা স্থানে প্রাচীনকালের যে সমুদয় নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের আকৃতিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেও বিজ্ঞানবিদেরা মনে করিতেন, যে কুড়ি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ দেখিতে গরিলার মত ছিল। কিন্তু এখন সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইউরোপে নানা স্থানে সম্প্রতি যে সমুদয় নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বহুপূর্ব্বেও মানুষের আকৃতি বর্ত্তমান সময়ের অনুরূপই ছিল। পাশে যে ছবি দেখিতেছ, অনুমান করা হইয়াছে, যে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের আকৃতি এইরূপ ছিল। এই ছবি হইতে বুঝিতে পারিবে, যে তখনকার মানুষ এবং এখনকার মানুষে আকৃতিগত পার্থক্য অতি অল্প। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানুষের মুখ অপেক্ষাকৃত লম্বা, চোয়ালযুক্ত ও ভারি ছিল, দাঁত এখনকার মতই ছিল। মস্তিষ্কও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ছোট ছিল না,

বরং মনে হয়, অনেক স্থানেই আজ-কালকার লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা একটু বড়ই ছিল। তাহারা প্রস্তরের যে সকল অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে বেশ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যযুগের লোকের হাত সবল ও সুদৃঢ় ছিল। আমরা যেরূপ ভাবে হাতের চালনা করি, তাহারাও সেইরূপ করিত, শরীরের নিম্নভাগের কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয় না, যে গমনাগমনের প্রণালী আমাদের হইতে তাহাদের ভিন্ন প্রকারের ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের আকৃতি এবং শারীরিক কার্য্যপ্রণালীতে বানর অপেক্ষা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্যই অধিক ছিল।

ইহা ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে মুকুলে প্রকাশিত হয়।

আকাশে যুদ্ধ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা তোমাদিগকে শূন্যপথে ভ্রমণের কথা লিখিয়াছিলাম। তাহার পরে হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বচক্ষে শূন্যপথে ভ্রমণ করা দেখিয়াছ। গত এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে * দুইটী আকাশগাড়ী আসিয়াছিল; প্রায় প্রতি দিনই তাহা আকাশে উঠিত। সে সময়ে যাঁহারা এলাহাবাদে গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা দেখিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, কেহ কেহ সেই আকাশ-শকটে চড়িয়াও ছিলেন। শুনিয়াছিলাম যে, একশত টাকা দিলে সেই আকাশ-গাড়ীতে চড়াইয়া বেড়াইয়া আনিত। সেই সময়ে একটী হাস্যোদ্দীপক গল্পও শুনিয়াছিলাম; তাহা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানি না। তবু গল্পটী তোমাদের বলিতেছি। আকাশ-গাড়ী দেখিয়া একজন মাড়োয়ারীর তাহাতে চড়িবার সখ হইয়াছিল। সেও একশত টাকা দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল; খানিক পরে যেই গাড়ী ভোঁ ভোঁ করিতে করিতে শূন্যে উঠিল, অমনি মাড়োয়ারীর মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল; তখন সে "নামাইয়া দাও" "নামাইয়া দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নামিয়া একশতটী

---

* ইহা ১৩১৮ সালের কথা।

টাকা দণ্ডের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে মাড়োয়ারী বীর গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গত বৎসর কলিকাতাতেও একখানি আকাশ-গাড়ী আসিয়াছিল এবং টালিগঞ্জের মাঠ হইতে কয়েক দিন তাহা আকাশে উঠিয়াছিল। তাহাতে চড়িয়া একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকও আকাশপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

আমাদের শূন্যপথ ভ্রমণ নামক পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, যুদ্ধে আকাশ-গাড়ী ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছিল। তখন যাহা চেষ্টা ছিল, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই যুদ্ধে আকাশ-গাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি তুর্কী এবং ইটালীতে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে ইটালী আকাশ-গাড়ী ব্যবহার করিতেছে। তাহারা আকাশ হইতে শত্রুসৈন্যের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা দেখিয়া তুর্কীসৈন্যদের মধ্যে মহা ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল। বোম্বা নিক্ষেপ ব্যতীত, শত্রু-সৈন্যদের অবস্থান, গতিবিধি প্রভৃতি অবগত হইবার পক্ষেও আকাশ-গাড়ীর দ্বারা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

তুর্কীদের আকাশ-গাড়ী নাই। কিন্তু ইউরোপের প্রধান জাতিগুলির প্রায় সকলেরই একাধিক সামরিক আকাশ-গাড়ী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষই আকাশ-

গাড়ী ব্যবহার করিবে; তখন হয়ত শূন্যপথেই যুদ্ধ হইবে। একদিকে যেমন যুদ্ধে আকাশ-গাড়ী ব্যবহারের আয়োজন চলিতেছে, অপরদিকে তাহা নষ্ট করিবারও উপায় হইতেছে। নীচ হইতে কামানের গোলা ছুড়িয়া আকাশ-গাড়ী ভাঙ্গিয়া দিবার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আকাশে দ্রুতগামী গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গোলা ছোড়া সহজ নহে। তবে নিশ্চয়ই অবিলম্বে তাহারও একটা ব্যবস্থা হইবে। এতদিন স্থলে ও জলে যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল, এখন হইতে আকাশেও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ফরাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। জলে ইংরাজেরা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, স্থলে জার্ম্মাণেরা, আকাশে বোধ হয়, ফরাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা সমরকুশল হইবে।

ইহা ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসের মুকুলে প্রকাশিত হয়

বৈদ্যুতিক ভোজবাজী।

গত ষাট সত্তর বৎসরে তাড়িৎশক্তির সাহায্যে মানুষ যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে এমন মিশিয়া গিয়াছে, যে এখন মনে হয় সেগুলি না হইলে দিন চলে না। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে সে সকল কিছুই ছিল না। আজ আমরা ইচ্ছা মাত্র ছয় আনা খরচ করিয়া * ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ কয়েক ঘণ্টায় আনাইতে পারিতেছি। কয়েকটি টাকা খরচ করিলে পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ড বা আমেরিকাস্থ বন্ধুকে সংবাদ প্রেরণ করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে পারি; ঘরে বসিয়া দূরস্থ বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে পারি। একশত বৎসর পূর্ব্বে লোকে এ সকল ব্যাপার কল্পনাও করিতে পারিত না। তাড়িতের সাহায্যে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল কাণ্ড করিয়াছে, তাহা ভোজবাজী অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা

---

* ইহা ১৩১৯ সালের লেখা; তখন টেলিগ্রামের মাশুল ।৶০ আনা ছিল; তাহার পর ।।০ আনা হইয়াছিল পরে ৵০ আনা হইয়াছে।

তোমাদিগকে সংক্ষেপে এই বৈদ্যুতিক ভোজবাজী এবং তাহার আবিষ্কর্ত্তাদের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

যদিও কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল তাড়িৎ-শক্তি ব্যবহারে মানুষ আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ইহার অস্তিত্ব মানুষের জানা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে মানুষ জানিত, যে বিভিন্ন বস্তুতে এক প্রকার অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার করিতে পারা যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বৈজ্ঞানিক থেলস্ দেখিয়াছিলেন, যে গালা ঘসিলে তাহাতে এক প্রকার আকর্ষণী-শক্তি জন্মে; এক প্রকার মাছ এবং অন্যান্য কোনও জন্তুর দেহেও এই প্রকার শক্তির অস্তিত্বের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। ইহার তিন শত বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক থিওফ্রষ্টস এই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমক পণ্ডিত প্লিনী তাড়িৎ শক্তির বিষয় লিখিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন-কালে তাড়িৎ-শক্তির সাহায্যে রোগ মুক্তিরও বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, যে রোমক সম্রাট টাইবিরিয়াসের এথেরো নামক একজন ক্রীতদাস এক প্রকার বৈদ্যুতিক মৎস্যের স্পর্শে বাত রোগ হইতে আরোগ্য

লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গথ্‌দের রাজা ওলিমার সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে তাঁহার গাত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

প্রাচীনকালে তাড়িৎ-শক্তি একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী হইতে তাড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। ডাক্তার গিলবার্ট নামক একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন। তাঁহাকেই বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ও পিতা বলা যাইতে পারে। ডাক্তার গিলবার্টের মৃত্যুর পরে রবার্ট বয়েল নামক অপর এক ব্যক্তি তাড়িৎ উৎপত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রায় সেই সময়ে অটো ভন গেরিক নামক একজন জার্ম্মান পণ্ডিতও এই প্রকারের পরীক্ষা করিতেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িতের বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুসেনব্রক, বেঞ্জামিন, ফ্রাঙ্কলিন, গ্যালভানি ও ভল্টার নাম সুপরিচিত। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় তাড়িৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িৎ উৎপন্ন

এবং সংগ্রহ করিয়া রাখিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাড়িৎ-শক্তি ধরিয়া মানুষের কাজে লাগান ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফল। এ বিষয়ে ইংলণ্ডকে পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্যার হাম্ফ্রি ডেভি, ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িতের প্রকৃতি, কার্য্য এবং শক্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাড়িৎ কি, ইহার কি শক্তি, কি প্রকারে কাহার দ্বারা সে সমুদয় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দিতে আমরা এখন চেষ্টা করিব না। তাড়িতের শক্তিতে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ইতিহাস দেওয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেই আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, এবং তাহাতেই আপনাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্য জ্ঞান। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত জ্ঞান মানুষের কাজে লাগাইয়া জগতের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরিশ্রমে তাড়িৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আর এক দল কর্ম্মকুশল বৈজ্ঞানিক বিবিধ উপায়ে মানুষের কাজে তাহা লাগাইয়া জগতের সুখ সমৃদ্ধি তদ্বারা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। নিম্নে তোমাদিগকে আমরা তাহার বিবরণ দিতেছি।

মানুষের কাজে তাড়িতের প্রথম প্রয়োগ টেলিগ্রাফের তারে। শীঘ্র দূর দেশে সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন মানুষ চিরদিনই অনুভব করিয়াছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশ জাতি বা দলের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিবাদ হইত, হঠাৎ শত্রু আসিয়া পড়িয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবার ভয় সর্ব্বদাই থাকিত। এরূপ অবস্থায় দ্রুতগতিতে দেশের দূরবর্ত্তী স্থানে শত্রুর আগমনের সংবাদ দেওয়ার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়াছে। প্রাচীনকালে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বালাইয়া শত্রুর আগমন জ্ঞাপন করা হইত। তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান, যে রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব সময়ে স্পেন দেশের রণতরী সকল যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, সমুদ্র তীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বালাইয়া তখন

দেশের লোককে শত্রু আগমনের বার্ত্তা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে মানুষের বুদ্ধি দূরে সংবাদ প্রেরণের আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। অনেক দেশে পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পায়রারা খুব দ্রুত উড়িতে পারে; শুনা যায় কোনও কোনও পায়রা ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল যাইতে পারে। এইরূপ দ্রুতগামী পায়রা পুষিয়া তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাদিগকে কোনও দূর স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে এক টানে উড়িয়া বাসস্থানে চলিয়া আসে। দূর স্থান হইতে শীঘ্র সংবাদ আনিবার প্রয়োজন হইলে এইরূপ পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যুদ্ধের সময় এই প্রকার পত্র-বাহক কপোত দ্বারা বিশেষ উপকার হইত। অনেক সময়ে অবরুদ্ধ নগরে পত্র-বাহক কপোত দ্বারা প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরিত হইত।

তাড়িতের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইবামাত্রই তাহা দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা অনুভূত হইয়াছিল। তাড়িৎ অতি দ্রুতবেগে গমন করে; তার বহিয়া তাহা এক মুহূর্ত্তে হাজার মাইল দূরে যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেই বুদ্ধিমান লোকেরা তাড়িতের

দ্বারা দূরদেশে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ সালে এ সম্বন্ধে প্রথম চেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বৎসর ‘স্কটস্ ম্যাগাজিন’ নামক একখানি সাময়িক পত্রিকাতে কোনও অজ্ঞাতনামা লেখক তাড়িতের সাহায্যে শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের উপায় বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, যে যদি দুইটি স্থানের মধ্যে বর্ণমালার যতগুলি অক্ষর ততগুলি তার লাগান যায় এবং এক একটী তারের অগ্রভাগের নীচে এক একটী অক্ষর রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি তারের সঙ্গে তাড়িতের যোগ স্থাপন করিয়া উভয় স্থানের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন তাহার অক্ষর চিহ্নিত তারগুলিতে যথাক্রমে তাড়িতের যোগ স্থাপন করিয়া দিলেই অপর প্রান্তের সেই সেই অক্ষরে তার লাগিবে, অপর প্রান্তের লোক সেই সেই অক্ষর লিখিয়া লইলেই, কি বলা হইতেছে,' বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার কয়েক বৎসর পরে লমণ্ড নামক একজন ফরাসীদেশীয় লোক এই উপায়ে সত্য সত্যই তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। লমণ্ড স্কটস্ ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ পড়েন নাই; নিজের স্বাধীন চেষ্টাতে তিনিও এই উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ

কবি আর্থার ইয়াঙ্ ফরাসীদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া লমণ্ডের টেলিগ্রাফ যন্ত্র দেখিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠান। তিনি লেখেন যে "এই ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাড়িতের সাহায্যে এক অদ্ভুত কল আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি কেহ একখানি কাগজে কিছু লিখিয়া দেন, লমণ্ড তাহা লইয়া একটী কামরায় প্রবেশ করেন এবং তাঁহার যন্ত্র চালান। অপর একটী কামরায় তাঁহার স্ত্রী আর একটী যন্ত্র দেখিয়া অবিকল তাহা লিখিয়া দেন। তারের দৈর্ঘ্যের ন্যূনাধিক্যে যন্ত্রের ক্রিয়ার কোনও তারতম্য হয় না। সুতরাং এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে।" ইহার সাত বৎসর পরে ১৭৯৪ সালে বেতনকুর নামক অপর একজন ফরাসী মাদ্রিদ হইতে আরানজুর নামক স্থানে ত্রিশ মাইল ব্যবধানে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হন।

ইহা ১৩১৯ সালের আষাঢ় মাসের মুকুলে প্রকাশিত হয়।

বৈদ্যুতিক ভোজবাজী।

(২)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি করিতেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁহাদের চেষ্টা প্রায় সফল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৬ সালে রোনাল্ডস্ নামক একজন ইংরেজ হ্যামারস্মিথে একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র খাটাইয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তিনি একতারে আট মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক, গাউস এবং ওয়েবার এক মাইল দূরে থাকিয়া তাড়িতের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। ইহাকেই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের যন্ত্রে অনেক ত্রুটী ছিল; সর্ব্বদা সাধারণের ব্যবহারে আনিতে তাহার অনেক উন্নতি সাধন প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ যন্ত্র নির্ম্মাণের গৌরব হুইটষ্টোন এবং কুক নামক দুইজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য। ইঁহাদের দুইজনের

সমবেত চেষ্টায় ১৮৩৭ সালে, অর্থাৎ পরলোকগত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ বৎসরে প্রথম রীতিমত টেলিগ্রাফের লাইন স্থাপিত হয়। এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস দিতেছি। তাঁহাদের জীবনকাহিনী একাধিক কারণে অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ। টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের জীবনী সকলেরই জানা উচিৎ। তদ্ভিন্ন তাঁহারা, বিশেষতঃ হুইটষ্টোন, যেরূপ সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন, সে কাহিনী গভীর শিক্ষা এবং আশাপ্রদ।

চার্লস হুইটষ্টোন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গ্লষ্টার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ নগরে গানের কাগজ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। চার্লস বাল্যকালে গ্লষ্টারের এক স্কুলে সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক কোনও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল বা কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই। বৈদ্যুতিক ভোজবাজীর সম্পর্কে যে সকল প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকদিগের বিষয় আমাদিগকে বলিতে হইবে, তাঁহাদের অনেকেরই সম্বন্ধে এই কথা খাটে। স্কুল

কলেজে পড়িয়া তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিজের চেষ্টাতে সামান্য অবস্থার মধ্যে তাঁহারা আপন আপন অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন। হুইটষ্টোন গ্লষ্টারের সামান্য স্কুলে পাঠ সময়েই অঙ্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতার আভাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতায় তৎকালে এই স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশের আর কোনও সুযোগ হয় নাই।

হুইটষ্টোনের বাল্যকালেই তাঁহার পিতা গ্লষ্টার হইতে লণ্ডনে আসিয়া বাস করেন। হুইটষ্টোনকে এই সময় হইতেই জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথমতঃ তিনি বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। হুইটষ্টোন যদিও তখন তাহা জানিতেন না, কিন্তু এই কার্য্য তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সহায় হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মকুশল, উদ্ভাবনশীল প্রকৃতি এই ব্যবসায়ে শব্দতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে করিতে হুইটষ্টোন অনেক প্রকার নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

১৮৩৩ সালে হুইটষ্টোন শব্দতত্ত্ব বিষয়ে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখন হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রসার লাভ করিতে লাগিল। পর

বৎসর তিনি তাড়িতের গতি বিষয়ে একটী অতি গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে আলোক অপেক্ষা তাড়িত দ্রুতগামী। জগদ্বিখ্যাত রয়াল সোসাইটীর একটী সভাতে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রশংসা করেন। ইহার কিছুদিন পরে হুইটষ্টোন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্লষ্টারের গানের কাগজ বিক্রেতার পুত্র, যিনি কোনও দিন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নাই, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দোকানে কাজ করিতে করিতে অবসর সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে লণ্ডনের ইউনভার্সিটী কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হওয়া সামান্য কথা নহে। দুই বৎসর পর তিনি রয়াল সোসাইটীর ফেলো মনোনীত হন। ইউনিভার্সিটী কলেজের যন্ত্রাগারে হুইটষ্টোন টেলিগ্রাফের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি টেলিগ্রাফ ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, আপাততঃ আমরা টেলিগ্রাফের বিষয়ই বলিব। টেলিগ্রাফের আবিষ্কার কতটা হুইটষ্টোনের নিজের কাজ, এবং কতটা তাঁহার সহযোগী কুকের তাহা নিশ্চয় করিয়া

বলা যায় না। ১৮৩৭ সালের প্রথম হইতে তাঁহারা একত্রে কাজ করিয়াছিলেন; সেই বৎসর জুন মাসে দুইজনে মিলিয়া নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ে ইউষ্টন ও ক্যামডেন টাউনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করিয়া তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণ সহজসাধ্য প্রমাণ করেন। কিন্তু তাহাতেও জনসাধারণের মধ্যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত হয় নাই, তাঁহাদিগকে আরও অনেক দিন অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের এই মিলিত চেষ্টার কথা পরে বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে হুইটষ্টোনের সহযোগী কুকের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিব।

কুক হুইটষ্টোন অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষারও অধিকতর সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার পিতা লণ্ডনের নিকটস্থ ইলিং নামক স্থানের ডাক্তার ছিলেন, এখানেই ১৮০৬ সালে উইলিয়াম ফথারগিল কুকের জন্ম হয়। কুকের জন্মের পরে তাঁহার পিতা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ডারহামে অবস্থিতি করেন। ডারহাম সহরে কুকের শিক্ষা আরম্ভ হয়; পরে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে

আসেন, এবং পাঁচ বৎসর কাল এদেশে অবস্থিতি করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করেন, এবং সেইজন্য প্রথমে পারিস ও তৎপরে জর্ম্মানির মিউনিক সহরে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ভবিষ্যতে যে কার্য্যের জন্য তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কুকের কোনও পারদর্শিতা বা আগ্রহ দেখা যায় নাই। মিউনিকে অবস্থান কালেই তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হয়। কুক যে অধ্যাপকের নিকট চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তাড়িত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং একদিন তিনি যে বিষয় পড়াইতেছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

কুক অতিশয় আগ্রহ এবং উৎসাহের সঙ্গে এই নূতন যন্ত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, যে এই উপায়ে দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার সুবিধা হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে কুক এই কার্য্যে আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায় প্রভৃতি আর কিছুই তাঁহার

চিন্তায় স্থান পাইল না। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

১৮৩৭ সালের প্রথমে কুক ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের সহিত পরিচিত হন। ফ্যারাডে তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া হুইটষ্টোনের সঙ্গে কুকের আলাপ করিয়া দেন। পরস্পরের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে ঘনিষ্ঠ আলাপের পর হুইটষ্টোন এবং কুক একত্র কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। এ বন্দোবস্ত ভালই হইয়াছিল; কারণ কুকের বিলক্ষণ ব্যবসায় বুদ্ধি এবং উদ্যম ছিল, হুইটষ্টোনের যাহা ছিল না; অপর দিকে হুইটষ্টোনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি অধিক ছিল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহার পেটেণ্ট গ্রহণ করিলেন। পেটেণ্ট গ্রহণ করিলে আর কেহ সে যন্ত্রের নকল করিয়া তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

এখন হুইটষ্টোন এবং কুক আপনাদের নির্ম্মিত যন্ত্র জনসাধারণে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে রেলের গাড়ী প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের

লাইন স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন ত টেলিগ্রাফের লাইন ছাড়া রেলওয়ের লাইন আমরা দেখিতেই পাই না। টেলিগ্রাফ ছাড়া রেল রাস্তার কাজ সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু প্রথম যখন রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল তখন টেলিগ্রাফের লাইন ছিল না। হুইটষ্টোন এবং কুক রেলওয়ে কোম্পানীগুলিকে টেলিগ্রাফের উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পরে ইংলণ্ডের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানী পরীক্ষার জন্য আপনাদের লাইনের ইউষ্টন ও ক্যামডেন টাউন নামক দুই ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার অনুমতি দিলেন। যথাসময়ে তার বসান হইল। ১৮৩৭ সালের ২৫শে জুলাই তার বসান এবং যন্ত্র প্রস্তুত হইল; সেই দিন তারে প্রথম সংবাদ প্রেরিত হইবে। হুইটষ্টোন এবং কুক অতিশয় ব্যগ্রতা এবং উৎকণ্ঠা-সহকারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই যন্ত্রের কৃতকার্য্যতার উপরে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু তাঁহারাও জানিতেন না, যে কেবল তাঁহাদের নহে ভবিষ্যৎ সভ্যতার গতিও অনেক পরিমাণে তাঁহাদের সেদিনের পরীক্ষার উপরে নির্ভর করিতেছিল।

হুইটষ্টোন একাকী ইউষ্টন ষ্টেশনে তারের এক প্রান্তে যন্ত্র ধরিয়া বসিলেন; ক্যামডেন টাউনে কুক সুবিখ্যাত ষ্টিভেন্সন এবং চার্লস-কক্সের সঙ্গে অপর প্রান্তস্থিত যন্ত্রের নিকটে দণ্ডায়মান। হুইটষ্টোন কল টিপিলেন, কুক তাঁহার প্রেরিত সংবাদ পড়িতে পারিলেন; তাঁহাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হইল। কিন্তু তবুও জনসাধারণ বা রেলওয়ে কোম্পানীরা এ বিষয়ে বেশী আগ্রহ দেখাইল না। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা শীঘ্র তার উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন, এমন কি একজন ডিরেক্টর নূতন হুজুক তুলিয়াছে বলিয়া হুইটষ্টোন এবং কুক ও তাঁহাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইলেও নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা নিজে পরীক্ষা করিয়া তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণ সহজসাধ্য বলিয়া দেখিয়াছেন; এখন জন-সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলনে যাহা বিলম্ব। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, যে শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক লোকে ইহার উপকারিতা বুঝিবেই বুঝিবে। ইতিমধ্যে তাঁহারা আপনাদের যন্ত্রেরও উন্নতিসাধন করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ সালে গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেল রাস্তায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইতে

অনুমতি পাইলেন। এই তার বেশ কাজ করিতে লাগিল। ১৮৪০ সালে হুইটষ্টোন তাঁহাদের যন্ত্রের আরও উন্নতি করিলেন। তখন লোকে ইহার উপকারিতা অনুভব করিতে লাগিল, এবং অনেক বড় বড় সহরের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃতকার্য্যতার মুহূর্ত্তে হুইটষ্টোন এবং কুকের মধ্যে টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারে আপন আপন অংশ লইয়া বিবাদ বাধিল। সে বিবাদের বিবরণ বা মীমাংসা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১৮৪৩ সালে হুইটষ্টোন এবং কুক বিবাদ রফা করিয়া গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যে টেলিগ্রাফ দেশের মধ্যে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই, যে ১৮৪৫ সালে ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ কোম্পানী হুইটষ্টোন এবং কুকের নিকট হইতে ১৪০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দুই কোটী বিশ লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহাদের পেটেণ্ট ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। অনতিবিলম্বে আবিষ্কর্ত্তাদের যশ দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হুইটষ্টোনকে "সার" উপাধি প্রদান করিলেন। ১৮৬৯ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি

প্রদান করেন। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট কুক্‌কেও "সার" উপাধি প্রদান করেন।

ইহা ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসের মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বর্ণ-রসায়ন।

(বৌদ্ধ উপকথা)

একজন লঘুচিত্ত সুখপ্রিয় ব্রাহ্মণ-যুবক শুনিয়াছিল, যে বুদ্ধদেব স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল জানেন। এই সংবাদ পাইয়া সে বুদ্ধদেবের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখিবার প্রার্থনা জানাইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি হাঁ, স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইতে পারি, কিন্তু হৃদয় শান্ত ও উন্নত না হইলে তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে, তাহাতে অকল্যাণ হয়।"

ব্রাহ্মণ-যুবক বলিল, সে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার হৃদয় উন্নত ও শান্ত হইয়াছে, তাহাকে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইলে কোনও অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা নাই। এই বলিয়া সে নির্ব্বন্ধসহকারে বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। কেবল ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে স্বর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেই সময় উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব সেই ব্রাহ্মণ-যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন

এবং সেখানে এক পর্ব্বতগুহায় প্রস্তরখণ্ড হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন। ব্রাহ্মণ-যুবক তাঁহার নিকট হইতে স্বর্ণ-রসায়নের প্রণালী শিক্ষা করিল। তখন বুদ্ধদেব সেই স্বর্ণপিণ্ডগুলি লইয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "কখনও স্বর্ণ প্রস্তুত করিও না, কারণ স্বর্ণ হইতে বহু অনর্থ উৎপন্ন হয়।"

তাঁহারা যখন নির্জ্জনে এই প্রকার কথোপকথন করিতে-ছিলেন, একদল দস্যু তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুদলেব নেতা তাঁহাদিগকে বলিল, "আমরা জানি, তোমরা সোণা প্রস্তুত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ। সেই সোনা আনিয়া দাও, নতুবা তোমাদের নিস্তার নাই।" বুদ্ধদেব তাহাদিগকে বুঝাইলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বলিল, "সেই সোনা আনিতেই হইবে; একজনকে ছাড়িয়া দিতেছি; অপর জনকে বন্দী থাকিতে হইবে, সাত দিনের মধ্যে যদি সোনা লইয়া ফিরিয়া না এস, তাহা হইলে বন্দীর মৃত্যু নিশ্চিত।" এই বলিয়া তাহারা বুদ্ধদেবকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-যুবককে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দেখিয়া তাহাকে প্রতিভূ-স্বরূপে বন্দী করিয়া রাখিল।

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-যুবককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই। আমি সপ্তম দিনে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছি তাহা কখনও লঙ্ঘন করিও না।"

একদিন দুইদিন করিয়া পাঁচদিন অতীত হইল। সেই দিন ভাদ্রমাসের শেষ দিন। সেদিন অতীত হইয়া গেলে আর এক বৎসর সোনা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে না। তখন ব্রাহ্মণ-যুবক মনে করিল, যদি বুদ্ধদেব ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে ত ডাকাতেরা তাহাকে বধ করিবে। তাহার অপেক্ষা সে নিজেই সোনা প্রস্তুত করিয়া তাহা ডাকাতদিগকে দিয়া মুক্তিলাভ করিবে। এই ভাবিয়া ডাকাতদিগকে বলিল, "আমাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া চল, সোনা প্রস্তুত করিয়া দিব।" ডাকাতেরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল।

রাত্রিতে নির্জ্জনে সোনা প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-যুবক প্রভাতে সেই স্বর্ণ দস্যুদিগকে দিল। তাহারা অবশ্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু ইতিমধ্যে অপর একদল দস্যু তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহারা তাহাদিগকে ঘেরিয়া বলিল, "হয় এই সোনার অর্দ্ধেক দাও, না হয় যুদ্ধ কর।" প্রথম দস্যুদল বলিল, "গণ্ডগোলে কাজ কি?

এই ব্রাহ্মণ যুবক সোনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে; তাহাকে তোমাদের হাতে দিতেছি। সে তোমাদিগকে যত চাও, সোনা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে।" দ্বিতীয় দস্যুদল আনন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহারা ব্রাহ্মণকে লইয়া বলিল, "আমাদিগকেও সোনা প্রস্তুত করিয়া দাও, নতুবা তোমার প্রাণবধ করিব।" তখন ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ভাদ্রমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আর স্বর্ণ-রসায়ন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ দস্যুদিগকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিল না। তাহারা ভাবিল, প্রথম দস্যুদল তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া পলাইয়াছে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহারা ব্রাহ্মণ-যুবককে হত্যা করিয়া প্রথম দস্যুদের অন্বেষণে ছুটিল। কিয়দ্দূরে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, তখন উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সারাদিন যুদ্ধের পর উভয় দস্যুদলই নিহত হইল, কেবল দুই দলে দুইজন অবশিষ্ট রহিল; তাহারাও শ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত, আর যুদ্ধ করিতে পারে না। তখন তাহারা বলিল, "আর যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, এস, দুইজনে এই সোনা সমান ভাগ করিয়া লই। আমাদের দুইজনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।" এই প্রস্তাবে উভয়েই সম্মত হইল।

তৎপর একজন বলিল, "এখন ত ক্ষুধায় প্রাণ যায়; সোনা খাইয়া ত বাঁচিতে পারিব না। তুমি এখানে বস; আমি কোথাও হইতে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনি; অপর ব্যক্তি বলিল, "সে বেশ কথা। তুমি শীঘ্র কিছু খাবার লইয়া আইস।" তখন প্রথম ব্যক্তি নিকটস্থিত গ্রামের বৈদ্যের নিকট হইতে বিষ আনিয়া কিছু খাবার কিনিয়া তাহাতে মিশাইল। অপর ব্যক্তি গোপনে একখানি ছুরি শাণিত করিয়া বসিয়া রহিল। উভয়েই অপরের প্রাণবধ করিয়া একাকী সমস্ত স্বর্ণপিণ্ড আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি খাদ্য হস্তে লইয়া আসিবা-মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফাইয়া তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। অবশিষ্ট দস্যুটী ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাহার হস্তস্থিত খাদ্য ভক্ষণ করিল। অল্পক্ষণ পরেই সে তীব্র বিষের প্রভাবে মরিয়া গিয়া নিহত দস্যুর পদতলে পতিত হইল।

সপ্তমদিনে বুদ্ধদেব আসিয়া সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত বুঝিলেন।

স্বর্ণ-খনি।

স্বর্ণ-খনি বলিতে মানস-চক্ষুর সম্মুখে কি চিত্র আসে? তোমাদের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেই কখনও সোনার খনি দেখ নাই; তবুও বোধ হয়, স্বর্ণ-খনি বলিতেই কল্পনায় একটী চিত্র আসে। সকলেই বোধ হয়, মনে করে স্বর্ণ-খনিতে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোনার ঢেলা পড়িয়া আছে; চারিদিক সোণার রঙে উজ্জ্বল; সেখানকার মাটী সোণার রঙের, সে এক অপূর্ব্ব রাজ্য! নয় কি? আমার ত সেইরূপ ধারণা ছিল। অনেক দিন হইতে স্বর্ণ-খনি দেখি-বার জন্য ঔৎসুক্য ছিল। মহীশূর রাজ্যে কতকগুলি স্বর্ণ-খনি আছে; ভারতবর্ষে সেইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্বর্ণ-খনি; প্রতি বৎসর বহু লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণ সেখান হইতে উঠে। অনেকবার আমি সেই স্বর্ণ-খনির নিকট দিয়া যাতায়াত করিয়াছি; প্রত্যেকবারই মনে করি, স্বর্ণ-খনি দেখিব; কিন্তু কোনও না কোন কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। স্বর্ণ-খনি দেখাত সহজ কথা নয়! এবার স্থির করিলাম, স্বর্ণ-খনি দেখিতেই হইবে। সুবিধাও ঘটিয়া উঠিল; আমার পরিচিত একজন লোক সেই স্বর্ণ-খনির পুলিশ-কর্ম্মচারী; সেখানে পুলিশের খুব কড়াকড়ি; তাহাত

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যেখানে সোনা লইয়া কারবার, সেখানে পুলিশের খুব ধূমধাম হইবেই। আমার সেই পরিচিত লোকটীকে লিখিলাম, যে আমি স্বর্ণ-খনি দেখিতে চাই, যাহা কিছু করিতে হয়, করিবেন। শুনিয়াছিলাম, সেখানে যাইতে হইলে অনুমতি-পত্রের আবশ্যক। নির্দ্ধারিত দিনে সেখানে উপস্থিত হইলাম; স্থানটীর নাম কোলার স্বর্ণ-ক্ষেত্র (Kolar gold-fields)। আমি ভাবিয়াছিলাম, ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই সোনালি রঙের ভূমি দেখিতে পাইব। কিন্তু তাহার কোনও চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। সাধারণ প্রস্তরময় স্থান, অন্যান্য সহরের মত ইহাও একটী ক্ষুদ্র সহর; সাধারণতঃ প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট খালাসীদের বাসের জন্য যেমন ছোট ঘর দেখা যায়, নূতনের মধ্যে সেই প্রকার অসংখ্য ঘর দেখিলাম। শুনিলাম, এখানে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কুলি বাস করে। নানা স্থান হইতে ইহারা আসিয়াছে; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন লোকেরও বাস ছিল না; কিন্তু এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটী মাঝারি রকমের সহর বসিয়া গিয়াছে। কোলার সহরের পথে পথে বৈদ্যুতিক আলো; অনেক শ্বেতাঙ্গের এখানে বাস; সুতরাং তাঁহাদের যাহা প্রয়োজন, সে সকলই আছে; টেনিস্-কোর্ট, প্রমোদাগার, পুস্তকালয়। আমার

পরিচিত লোকটী আমাকে প্রথমে সেই সকল দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সে সকল দেখিবার ব্যগ্রতা ছিল না; আমি সোনার খনি দেখিবার জন্যই উৎসুক; কতক্ষণে স্বর্ণ খনি দেখিব সেই জন্যই মন ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। দূরে কারখানার চিম্‌নি হইতে ধূম উঠিতেছে, শুনিলাম, ঐগুলি স্বর্ণ খনি; সেখানে অনেকগুলি স্বর্ণ খনি আছে; তবে দেখা সম্ভব নয়; তবে যে খনিটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহা দেখিবার অনুমতি পত্র পাওয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই; সর্ব্বাগ্রে সেখানেই যাওয়া যাউক।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, বিস্তৃত কারখানা। অনেক ঘর বাড়ী; কোথাও পাথরের স্তূপ, কোথাও উচ্চ ছাইএর স্তূপ; কিন্তু আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, সোনা কোথায়? তখন আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল, ঐ পাথরের মধ্যেই সোনা আছে। অনেক নীচে হইতে পাথর কাটিয়া তুলিয়া আনা হয়; পরে কারখানার পাথর হইতে সোনা বাহির করা হয়। পাথর দেখিয়া তাহাতে সোনার কোনও চিহ্ন দেখিলাম না, সচরাচর যেমন পাথর দেখিতে পাওয়া যায়, এও সেইরূপ পাথর; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে, অল্প ছাই রঙের পাথর; খনির মধ্য হইতে বৈদ্যুতিক কলে টানিয়া

তোলা হইতেছে। শুনিলাম, পাথর কাটিতে কাটিতে এখন দুই তিন মাইল গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক কলে কুলিরা খনির মধ্যে নামিয়া যায়, এবং উঠে। খনির মধ্যে গাঢ় অন্ধকার; বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে কুলিরা সেখানে কাজ করে; দুই তিন মাইল নীচে মাটীর মধ্যে সহরের পথের মত পথ হইয়াছে; মাঝে মাঝে এক একটী প্রকাণ্ড পাথরের থাম; অনেক সময় পাথর ভাঙ্গিয়া লোকের মাথায় পড়ে, খনির মধ্যে অনেক বিপদ; প্রায়ই লোক জন মারা যায়। আমার সঙ্গী বলিলেন, ভিতরে যাওয়া বিপজ্জনক, সেখানে কিছু দেখিবারও নাই; কেবল সেখান হইতে পাথর কাটিয়া উপরে আনা হয়। তাহা দেখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ হইল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, খনির মধ্যে পাথরের মত সোনার ঢেলা আছে; কেবল পাথর দেখিবার জন্য দুই তিন মাইল নীচে ঘন অন্ধকারের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন কি? আবার শুনিলাম, অনবরত উপর হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িয়া কাপড় চোপড় ময়লা হয় ও ভিজিয়া যায়।

আমি বলিলাম পাথর দেখিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে পাথর হইতে সোনা বাহির করে, তাহা দেখিতে

চাই। এবার একটা প্রকাণ্ড ঘরের সম্মুখে গেলাম; দ্বারে প্রহরী ছিল; আমাদের প্রবেশ পত্র দেখাইতে সে দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! মনে করিয়াছিলাম, সেখানে কি অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিব। তাহার পরিবর্ত্তে ভীষণ শব্দ; কাণ ফাটিয়া যায়; এমন ভয়ঙ্কর শব্দ আমি কখনও শুনিত নাই, কল্পনায়ও ভাবিতে পারিতাম না। তাড়াতাড়ি দুই কাণে আঙ্গুল দিয়া ধরিলাম; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। প্রবেশ করিয়া হঠাৎ বাহির হইবারও উপায় নাই। সেখানে কথা বার্ত্তাও চলে না; সে মহা শব্দের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও একটী কথা শোনা যায় না। ঘরের ভিতরে কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী রহিয়াছে; একজন এক স্থানে বসিয়া আহার করিতেছিল। এ ভীষণ শব্দের মধ্যে মানুষ কি করিয়া দীর্ঘকাল থাকিতে পারে, আমি ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না; আমার মনে হইল, "সোনা দেখিবার সাধ মিটিয়াছে, এখন বাহির হইতে পারিলে হয়।" পরে শুনিলাম, যাহাদিগকে এই কারখানার মধ্যে কাজ করিতে হয়, তাহারা মোম ও তূলা দিয়া কাণ বন্ধ করিয়া রাখে; নতুবা কাহার সাধ্য সেখানে তিষ্ঠিতে পারে? কোনও প্রশ্ন করিতে হইলে, কাগজ

বা শ্লেটে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করে, অপর ব্যক্তি লিখিয়াই উত্তর দেয়। আমার সঙ্গীটি একজন কর্ম্মচারীকে একখানি কাগজে লিখিয়া জানাইলেন, যে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছি; আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাহা একটু দেখাইয়া দিন। তিনি কলগুলি দেখাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড ঘর, তাহার দুই পার্শ্বে দুই সারি কল; সকলগুলি একই প্রকারের। এখানে কলগুলি আর কিছুই নহে; খুব ভারী লোহার লম্বা মুদ্গর উঠিতেছে ও নামিতেছে; তাহার আঘাতে পাথর চূর্ণ হইতেছে। এইরূপ বোধ হয়, তিন চারি শত লোহার মুদ্গরে অনবরত পাথর চূর্ণ হইতেছে। তাহার জন্যই ভয়ানক শব্দ, পাথরগুলি পিষিয়া একেবারে ছাতুর মত হইয়া যাইতেছে। তৎপরে একটী নল দিয়া তাহার উপরে কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জল আসিয়া পড়িতেছে। যেখানে পাথর চূর্ণ হইতেছে, বা জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া গেল না; সেগুলি লৌহের আবরণে আচ্ছাদিত। আমরা কেবল দেখিতে পাইলাম, উপরে মুদ্গর উঠিতেছে ও নামিতেছে এবং নিম্নে প্রতি যন্ত্রের পাদমূল হইতে কাল জলের ধারা বহির্গত হইতেছে। এই জল ধারা একখানি ঢালু ও মসৃণ

পাথরের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে; তাহার উপরে একখানি লৌহ-ফলক সংলগ্ন আছে; বালি-মিশ্রিত জল চলিয়া গেলে যেমন পলি পড়িয়া যায়, লৌহ-ফলকের উপরে প্রস্তর খণ্ডে সেইরূপ পলি পড়িয়া যাইতেছে। প্রস্তর খণ্ডের উপরে পারদ আছে; উপর হইতে যে জলধারা আসিতেছে, তাহার সঙ্গে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত আছে; জল দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, যে তাহাতে স্বর্ণরেণু আছে; তাহা পাথরের মতই কাল; কিন্তু তাহার সঙ্গে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত আছে; পারদের উপর দিয়া জল যখন গড়াইয়া যায়, তখন স্বর্ণরেণুগুলি পারদে আট্‌কাইয়া যায়। খানিক-ক্ষণ জল গড়াইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পাথরের গায়ে চট্‌চটে কাদার মত এক স্তর পলি পড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগকে কর্ম্মচারী তাহা তুলিয়া বলিলেন, ইহারই মধ্যে সোনা আছে। সহজ চক্ষুতে কিন্তু তাহাদের মধ্যে সোনার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। বরং মনে হয়, কাল মাটীর একটী গোলা। এখানে সোনা বলিতে ইহাই দেখিলাম; এর চেয়ে হরিদ্রা বর্ণের আর কিছুই দেখিলাম না। এইরূপে পাথর চূর্ণ করিয়া কলের সাহায্যে তাহার মধ্যস্থিত কণা কণা স্বর্ণরেণু পারদের সঙ্গে আট্‌কাইয়া রাখা হইতেছে। সেই স্বর্ণরেণু মিশ্রিত পারদের গোলা

সংগৃহীত করিয়া আর একটী কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়, এবং সেখানে কোনও প্রক্রিয়ায় পারদ হইতে স্বর্ণরেণু পৃথক করিয়া লওয়া হয়। সে কারখানায় কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। সপ্তাহে দুই দিন মাত্র সে কারখানায় কাজ হয়। যেখানে লৌহ মুদ্গরগুলি অবিরাম গতিতে উঠিতেছে ও নামিতেছে, সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরে উঠিয়া দেখিলাম, বাহির হইতে ছোট ছোট গাড়ীতে কলের দ্বারা ক্রমাগত প্রস্তর খণ্ড আসিতেছে, এবং প্রত্যেক যন্ত্রের উপরে একটী ছিদ্র দ্বারা প্রস্তর খণ্ড ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, বড় বড় ঢেলার মত সেই পাথরগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে পিষিয়া ছাতুর মত সূক্ষ্ম হইয়া জলের সঙ্গে নিম্নে বাহির হইয়া যাইতেছে।

যে জল বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হয় না। পারদ কর্ত্তৃক স্বর্ণরেণু আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে সমুদয় স্বর্ণ ধরা পড়ে না। তাহার কিয়দংশ জলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। জল হইতে সেই স্বর্ণ বাহির করিয়া লইবার জন্য আর একটী কারখানা আছে। সেটীও আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথম কারখানা হইতে যে জল নির্গত হয়, তৎসমুদয় এই কারখানার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড জলাধারে সংগৃহীত হয়। তৎপরে

তাহার সঙ্গে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। জল হইতে স্বর্ণকণা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার ইহার শক্তি আছে। তাহার জন্য বিস্তৃত প্রক্রিয়া আছে, কোনও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে কয়েকদিন রাখিতে হয়; তৎপরে যন্ত্রের মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া যায়; তখন অবশিষ্ট স্বর্ণরেণু পড়িয়া থাকে।

স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া লইলে যে প্রস্তরচূর্ণ অবশিষ্ট থাকে, তাহা কারখানার বাহিরে স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহা একটী নাতিক্ষুদ্র পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। শুনিলাম, তাহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ সোনা আছে; তবে তাহা বাহির করিতে অনেক আয়াস ও ব্যয়ের প্রয়োজন; আপাততঃ তাহা করা হইবে না; এখন যথেষ্ট সোনা বাহির হইতেছে, যখন এই উপায়ে যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যাইবে না, তখন ঐ চূর্ণ পাথরের স্তূপ হইতে অবশিষ্ট স্বর্ণ বাহির করিবার চেষ্টা হইবে। শুনিলাম, একটী জাপানী কোম্পানী যথেষ্ট মূল্য দিয়া ঐ স্তূপ হইতে সোনা বাহির করিবার অধিকার চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই।

আমার ধারণা ছিল, বুঝি খনিতে সোনার ঢেলা পড়িয়া আছে, খুঁড়িয়া আনিলেই হয়। এখন দেখিলাম, সোনা

তোলা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই পাথরের মধ্যে যে সোনা আছে, তাহা জানিতে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন; পরে খুঁড়িয়া মাটীর মধ্য হইতে পাথর তুলিয়া তাহা হইতে সোনা বাহির করিয়া লওয়া অতি কঠিন ব্যাপার।

---

* ইহা ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের 'মুকুলে' প্রকাশিত হয়।

গাছের কথা।

(ফুল)

আমরা সকলেই ফুল ভালবাসি। সাদা, লাল, হল্‌দে, গোলাপী ইত্যাদি নানা রং‌এর ফুল থাকিলে বাগানের কেমন শোভা হয়, উহাদের তুলিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিলে ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়ে এবং ফুলের সুগন্ধে ঘর আমোদিত হয়। সামান্য মাটী হইতে আহার লইয়া ফুলের কি করিয়া এমন সুন্দর বর্ণ ও গন্ধ হয় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুল পাতার রূপান্তর। পাতার মত ইহা কাণ্ড হইতে বাহির হয়। কখন একটী বোঁটায় একটী-মাত্র ফুল উৎপন্ন হয়, আবার কখনও অনেকগুলি ফুল একটী বোঁটা হইতে বাহির হয়। সকল গাছেই ফুল হয়। যে সমুদয় ফুলে নানা বর্ণ হয়, তাহাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিন্তু যে গাছের ফুলের বর্ণ নাই, তাহাকে আমরা ফুল বলিয়াই চিনিতে পারি না, মনে করি, সে গাছে ফুল হয় না।

একটী জবা কিংবা গোলাপ ফুল লইয়া দেখিবে, উহার বোঁটা আছে। কোন কোন ফুলে বোঁটা থাকে না।

ফুলের সকলের নীচে কতকগুলি সরু সরু সবুজ পাতার মত দেখিবে, উহাদিগকে বহিস্পুট বলে। জবা ফুলে সাধারণতঃ পাঁচটী বহিস্পুট থাকে। এই বহিস্পুটগুলি ফুলের অন্যান্য অংশকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করে। ইহারা ফুলটীকে ঢাকিয়া রাখে, যেন শীত বাত লাগিয়া উহা নষ্ট হইয়া না যায়। এই আবরণ থাকাতে পোকা, মাকড় ফুলের ভিতর গিয়া উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। যখন ফুলটী ফুটিয়া উঠে, এবং তাহার অন্যান্য অংশ বড় হইয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তখন ঐ সবুজ রংএর বহিস্পুটগুলি শুকাইয়া যায়। ইহার পর লাল রংএর পাপড়ি দেখিতে পাইবে। জবা ফুলের পাঁচটী পাপড়ি হয়। কোন কোন ফুলে চারিটী পাপড়ি থাকে, যেমন সরিষা, কোন ফুলে তিনটী পাপড়ি দেখা যায়, যেমন আতা ও কাঁঠালী চাঁপা। আতা এবং কাঁঠালী চাঁপার পাপড়ি সবুজ রংএর, অনেকটা পাতার মত। জবার পাপড়িগুলি পরস্পর জোড়া। জবা ফুলের মাঝখানে কতগুলি সরু সরু সূতার মত ডাঁটা আছে, তাহাদের মাথায় ছোট ছোট থলেতে হরিদ্রা বর্ণের রেণু দেখা যায়; উহাদিগকে পরাগকোষ বলে। তাহার পর ঠিক মাঝখানে সূতার মত সরু একটী ডাঁটা দেখিবে, তাহার মাথায় থবে

নাই। উহাকে গর্ভকেশর বলে। জবা ফুলটীকে লম্বালম্বি চিরিয়া দেখিলে গর্ভ-কেশরের নীচে ছোট ছোট কুঠুরীর মত দেখিতে পাইবে। উহাকে বীজ-কোষ বলে, কারণ উহার মধ্যে বীজ থাকে। পরাগ-কেশরে যে হরিদ্রা বর্ণের গুঁড়া থাকে, তাহা গর্ভ-কেশরে পড়িলে বীজ-কোষের মধ্যস্থিত ছোট ছোট বীজগুলি পরিপক্ক হয়। এই বীজ মাটীতে পুঁতিলে তাহা হইতে আবার গাছ বাহির হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ফুল গাছের বংশ বৃদ্ধি করে। পরাগ-রেণু কখনও কখনও বাতাসে উড়িয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যায়। সাধারণতঃ মৌমাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ এই রেণু বহন করে। উহারা মধুর লোভে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যায়, সেই সময়ে উহাদের গায়ে ফুলের রেণু লাগিয়া যায়, এবং অন্য ফুলে যাইবার সময় ঐ পরাগ-রেণু সেই ফুলের গর্ভ-কেশরে লাগিয়া যায়। অনেক সময় ফুলের গঠন এমন্ হয়, যে পতঙ্গ অজ্ঞাতসারে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বহিয়া লইতে বাধ্য হয়। ফুলের পাপড়ি নানা বর্ণের হয় কেন? সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া মৌমাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ সহজে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উহাতে আসিয়া বসে। মৌমাছিদের লোভ দেখাইবার জন্য ফুলেতে মধু এবং

ফুলের সকলের নীচে কতকগুলি সরু সরু সবুজ পাতার মত দেখিবে, উহাদিগকে বহিস্পুট বলে। জবা ফুলে সাধারণতঃ পাঁচটী বহিস্পুট থাকে। এই বহিস্পুটগুলি ফুলের অন্যান্য অংশকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করে। ইহারা ফুলটীকে ঢাকিয়া রাখে, যেন শীত বাত লাগিয়া উহা নষ্ট হইয়া না যায়। এই আবরণ থাকাতে পোকা, মাকড় ফুলের ভিতর গিয়া উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। যখন ফুলটী ফুটিয়া উঠে, এবং তাহার অন্যান্য অংশ বড় হইয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তখন ঐ সবুজ রংএর বহিস্পুটগুলি শুকাইয়া যায়। ইহার পর লাল রংএর পাপড়ি দেখিতে পাইবে। জবা ফুলের পাঁচটী পাপড়ি হয়। কোন কোন ফুলে চারিটী পাপড়ি থাকে, যেমন সরিষা, কোন ফুলে তিনটী পাপড়ি দেখা যায়, যেমন আতা ও কাঁঠালী চাঁপা। আতা এবং কাঁঠালী চাঁপার পাপড়ি সবুজ রংএর, অনেকটা পাতার মত। জবার পাপড়িগুলি পরস্পর জোড়া। জবা ফুলের মাঝখানে কতগুলি সরু সরু সূতার মত ডাঁটা আছে, তাহাদের মাথায় ছোট ছোট থলেতে হরিদ্রা বর্ণের রেণু দেখা যায়; উহাদিগকে পরাগকোষ বলে। তাহার পর ঠিক মাঝখানে সূতার মত সরু একটী ডাঁটা দেখিবে, তাহার মাথায় থলে

নাই। উহাকে গর্ভকেশর বলে। জবা ফুলটীকে লম্বালম্বি চিরিয়া দেখিলে গর্ভ-কেশরের নীচে ছোট ছোট কুঠুরীর মত দেখিতে পাইবে। উহাকে বীজ-কোষ বলে, কারণ উহার মধ্যে বীজ থাকে। পরাগ-কেশরে যে হরিদ্রা বর্ণের গুঁড়া থাকে, তাহা গর্ভ-কেশরে পড়িলে বীজ-কোষের মধ্যস্থিত ছোট ছোট বীজগুলি পরিপক্ক হয়। এই বীজ মাটীতে পুঁতিলে তাহা হইতে আবার গাছ বাহির হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ফুল গাছের বংশ বৃদ্ধি করে। পরাগ-রেণু কখনও কখনও বাতাসে উড়িয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যায়। সাধারণতঃ মৌমাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ এই রেণু বহন করে। উহারা মধুর লোভে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যায়, সেই সময়ে উহাদের গায়ে ফুলের রেণু লাগিয়া যায়, এবং অন্য ফুলে যাইবার সময় ঐ পরাগ-রেণু সেই ফুলের গর্ভ-কেশরে লাগিয়া যায়। অনেক সময় ফুলের গঠন এমন হয়, যে পতঙ্গ অজ্ঞাতসারে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বহিয়া লইতে বাধ্য হয়। ফুলের পাপড়ি নানা বর্ণের হয় কেন? সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া মৌমাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ সহজে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উহাতে আসিয়া বসে। মৌমাছিদের লোভ দেখাইবার জন্য ফুলেতে মধু এবং

মিষ্ট গন্ধ হয়। ফুলেরা যেন মৌমাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গদের ডাকিয়া বলে,—"এস আমাদের সুন্দর পাপড়ির উপরে বসিয়া মধু পান করিয়া যাও এবং যাইবার সময় আমাদের পরাগ-রেণু অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যাইও।" সাদা ফুলগুলি সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে ফোটে, কারণ অন্ধকারে সাদা রং সহজেই পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে। অন্য বর্ণ রাত্রিতে তত ভাল করিয়া দেখা যায় না। যে সমুদয় ফুলের রেণু বাতাসে উড়িয়া অন্য ফুলে যায়, তাহাদের আর পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিবার আবশ্যক হয় না, তাই তাহাদের বর্ণের উজ্জ্বলতা কিংবা সুন্দর গন্ধ থাকে না। উহাদের পরাগ-রেণু প্রচুর হয়, কারণ বাতাসে উড়িয়া যাইবার সময় অনেকগুলি পথে নষ্ট হয় এবং গর্ভ-কেশরে পৌঁছিতে পারে না। পরাগ-রেণু অতিশয় সূক্ষ্ম, লঘু এবং শুষ্ক হয়, যেন তাহারা সহজেই উড়িতে এবং অনেকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে, যেমন ঘাস পাইন ইত্যাদি। ইহাদের গর্ভ-কেশর বড় ও কুঞ্চিত হয় যেন সহজেই উহাতে পরাগ-রেণু আটকাইতে পারে। উহাদের ফুলগুলি ছোট হয় এবং উহাতে মধু কিংবা সুগন্ধ থাকে না।

যে সমুদয় ফুলের পরাগ মৌমাছি কিংবা অন্যান্য পতঙ্গ

এক ফুল হইতে অন্য ফুলে লইয়া যায় তাহাদের সুন্দর রং হয় এবং তাহাতে মধু ও সুগন্ধ থাকে। উহাদের পরাগগুলি চট্‌চটে হয়, যেন সহজে পতঙ্গের গায়ে আটকাইয়া যাইতে পারে। উহাদের পরাগ অধিক হয় না এবং পরাগের গায়ে কাঁটা থাকে তাহাতে উহারা সহজে মৌমাছির পায়ে আট্‌কাইয়া যায়। একটী ফুলের পরাগ সেই ফুলের গর্ভ-কেশরে পড়িলে যে বীজ হয়, তাহা হইতে ভাল গাছ জন্মে না। কিন্তু সেই পরাগ যদি অন্য ফুলের গর্ভ-কেশরে পড়ে, তাহা হইলে যে বীজ হয়, তাহার গাছ ভাল হয়। সাধারণতঃ একই ফুলে পরাগ-কেশর এবং গর্ভ-কেশর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কোন কোন ফুল আছে, যাহাতে শুধু পরাগ-কেশর কিংবা কেবল গর্ভ-কেশর থাকে, যেমন লাউ, কুমড়া। কখন কেবল পরাগ-কেশর বিশিষ্ট কিংবা গর্ভ-কেশর বিশিষ্ট ফুল একই গাছে জন্মে, কখন কখন উহারা ভিন্ন গাছে জন্মে, যেমন তাল, পেঁপে ইত্যাদি। জটা তালগাছে যে সমুদয় ফুল হয়, তাহাতে গর্ভ-কেশর থাকে না। কেবল পরাগ-কেশর থাকে। কোন কোন ফুলে বহিস্পুট কিংবা পাপড়ি থাকে না কেবল পরাগ-কেশর কিংবা গর্ভ-কেশর থাকে যেমন—কচু। এমন ফুলও দেখা যায়

যাহাতে পরাগ-কেশর কিংবা গর্ভ-কেশর কিছুই নাই, তাহাদের শুধু পাপড়ি থাকে।

সম্পূর্ণ